সাম্য একমাত্র ইসলামে

আনসার আলী খান

সাম্য একমাত্র ইসলামে

মুহাম্মদ আনসার আলী খান

আল-ইহসান প্রকাশনী
১৬৭, শান্তিবাগ, ঢাকা-১৭

প্রকাশক ঃ
খন্দকার মুহাঃ আবু ফাতেহ
৮২, এলিফ্যান্ট রোড
মগবাজার, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশকাল ঃ জুলাই, ১৯৮৬ ইং

মূল্য ঃ আট টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ সোচ্চার প্রিন্টিং প্রেস
১৭১/১, শান্তিবাগ (২য় গলি)
ঢাকা-১৭
ফোন ঃ ৪০৭৮১৬

ভূমিকা

সাম্য সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ না থাকায় জীবনের অনেক সময় আলেয়ার পিছনে ঘুরেছি। 'সাম্য' শব্দটা অত্যন্ত ব্যাপক তথা সূক্ষ্মও বটে। এর মর্মমূলে পৌঁছিয়ে তদসংক্রান্ত ধারণা অর্জন বেশ প্রচেষ্টা সাপেক্ষ। সঠিক ধারণা ভিন্ন কোন জিনিষের অনুসারী বা ভক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাই বেশ চিন্তা-ভাবনা করে, যেখানে এ সম্পর্কে যা পেয়েছি মোটামুটি তা আহরণ করতঃ সাম্য সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা অর্জন করতে পেরেছি।

ইলম বা জ্ঞান অর্জন; এবং তা দান মানুষের জন্য অপরিহার্য। তাই মানুষ হিসেবে এহেন অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদনের উৎস হিসেবে সাম্য সম্পর্কে অর্জিত ধারণাকে অসি-মসির সাহায্যে আমার অপর অপর ভাইদের উদ্দেশ্যে পরিবেশন করলাম।

ভুলের উর্ধে মানুষ নয়। তাই মানুষ হিসেবে আমার ভুল-ত্রুটি হওয়াটা স্বাভাবিক। ভুলের মাশুল অনেক হতে পারে, যদি তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে না বিবেচনা করা হয়। আমি আশা করি সুহৃদ পাঠকগণ আমার অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করে ক্ষমা করে উভয় উভয়কেই ধন্য করবেন।

অতঃপর যে সাধনা, চেষ্টা, প্রচেষ্টা বা যা কিছু প্রয়োজন উক্ত পুস্তিকা খানি প্রণয়নে করেছি, তা তখনই স্বার্থক বলে মনে করব, যদি কিনা কোন পাঠক এ থেকে কিঞ্চিত কোন কল্যাণকর কিছু পেয়ে জীবন-জগতকে তদ্দ্বারা উদ্ভাসিত করতে সচেষ্ট হন।

সর্বোপরি আল-ইহসান প্রকাশনী পুস্তিকা খানি যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করে এহেন অধমের শ্রমের মূলধন পাঠকবর্গের সমীপে পেশ করেছেন, তাকে বা তাদের প্রত্যেকেই জানাই কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া তাদেরকেও জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা তথা কৃতজ্ঞতা যাদের খুরধার লিখনী আমাকে এ কাজে রস সিঞ্চন করেছে। আমার দর্পণ স্বরূপ সব ধরণের সমালোচনা ও পরামর্শের ভার পাঠকদের হাতেই রইল।

এম, এ, এ, খান

সূচীপত্র

১।	সাম্য কি ?	৫
২।	(ক) প্রথম শর্ত ঃ	৭
	(খ) দ্বিতীয় শর্ত ঃ	৮
	(গ) তৃতীয় শর্ত ঃ	১১
৩।	এই পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান	১২
৪।	ধন-সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে খেলাফতের দায়িত্ব	১৩
৫।	সাম্যের মূলনীতি ঃ— ইসলাম	১৬
৬।	(ক) কল্যাণ কামনা	২০
	(খ) আত্মত্যাগ	২২
	(গ) আদল (সুবিচার)	২৬
	(ঘ) ইহসান (সদাচরণ)	২৮
৭।	(ক) কোন মানুষ কোন মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না	৩১
	(খ) দেহ ও মনের ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা দান	৩২
	(গ) উপহাস	৩২
	(ঘ) তুচ্ছ জ্ঞান করা	৩৩
	(ঙ) হিংসা	৩৩
৮।	সাম্য প্রতিষ্ঠার উপায় ঃ কতিপয় প্রশিক্ষণ	৩৫
	(ক) নামাজ	৩৫
	(খ) রোজা	৩৭
	(গ) হজ্জ	৩৮
	(ঘ) যাকাত	৩৯
	(ঙ) সাদকা, দান, ফিতরা ও উশর	৪০
	(চ) সুদ	৪১
৯।	পুঁজিবাদে সাম্য	৪৩
১০।	সমাজতন্ত্রে সাম্য	৪৯
১১।	উপসংহার	৫৮
২।	গ্রন্থপঞ্জী	৬১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সাম্য একমাত্র ইসলামে

প্রথম অধ্যায়

সাম্য কি ?

সাম্য অর্থ সমান। ছোট-বড়, কম-বেশী, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, উচু-নিচু অথবা বৈচিত্রতা হীনতাই হ'ল সাম্যের শব্দগত অর্থের সঠিক প্রকাশ। কোন ক্ষেত্রে এই শব্দটির প্রয়োগ দ্বারা মূলতঃ অনুরূপ ভাবার্থই প্রকাশ পায়। আমরা জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত উক্ত শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। তবে আজ আমরা এই শব্দটিকে কেবল মাত্র মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব। কেন না মানব সমাজে একটি প্রবাদ আদিকাল থেকে চলে আসছে—'মানুষ সব সমান'। পৃথিবীর প্রতিটা রাষ্ট্রে ও জন সমাজে উক্ত প্রবাদটি বহুল প্রচলিত। তাই অদ্যকার মুখ্য বিষয় 'মানুষ সব সমান' প্রবাদটি কতটুকু সত্য তথা বাস্তব তা যাচাই-বাছাই করে দেখা।

বাস্তবে 'মানুষ সব সমান' কথাটা কতটুকু সত্য? বাস্তব দৃষ্টে মনে হয় এই প্রবাদটি মিথ্যা। মানুষের আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র এমন কি কোন ক্ষেত্রেই এর সামান্য পরিমাণ সদার্থক পরিচয় মিলে না-নঞার্থক ছাড়া। প্রকৃতিগত বা জন্মগত দিক থেকে কেউ কারোর সমান নয়। কি আকার-আকৃতিতে, কি চেহারা-সুরতে, কি কথা-বার্তায়, কি বিবেক-বুদ্ধিতে, কি শক্তি-সামর্থে, কি অংগ-প্রত্যঙ্গে, কি জন্ম-মৃত্যুতে, কি মান-মর্যাদায়, কি ত্যাগ-তিতীক্ষায়, কি শিল্প-কলায়, কি মাপ-পরিমাপে, কি আবেগ-অনুভূতিতে, কি চিন্তা-ভাবনায়, কি ব্যক্তি-ব্যক্তিত্বে, কি দর্শন-প্রত্যক্ষণে, কি রুচি-অভিরুচিতে, কি কাম-প্রবৃত্তিতে, কি জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভৃতি ক্ষেত্রে একজন অপর জন থেকে পৃথক। কারোর সাথে কারোর হুবহু মিল নেই। সম্পর্ক গত দিক দিয়ে, কেউ রাজা, কেউ প্রজা, কেউ প্রচুর

খাচ্ছে, কেউ না খেয়ে মরছে, কেউ দুঃখ করছে, কেউ মহাসুখে দিন কাটাচ্ছে, কেউ মিথ্যা বলছে, কেউ সত্য বলতে গিয়ে মার খাচ্ছে; কেউ প্রভু সাজছে, কেউ গোলাম হচ্ছে, কেউ আইন রচনা করছে, কেউ তা পালন করছে, কেউ আবার করছে না, কেউ পায়ে হেটে যাচ্ছে, কেউ টয়োটাতে যাচ্ছে, কেউ খাদ্যের অবশিষ্টাংশ ড্রেনে ফেলছে, কেউ তা কুড়ায়ে খাচ্ছে, কেউ অপচয় করছে, কেউ প্রয়োজন মিটাতে পারছে না, কেউ চোখ রাংগাচ্ছে, কেউ চোখ রাংগানো দেখছে, কেউ স্বার্থ সিদ্ধি করছে, কেউ স্বার্থ হারাচ্ছে, কেউ প্রতারণা করছে, কেউ প্রতারিত হচ্ছে, কেউ ধর্ষণ করছে, কেউ ধর্ষিতা হচ্ছে, কেউ হত্যা করছে, কেউ হত্যার শিকার হচ্ছে প্রভৃতি অবস্থার প্রেক্ষিতে এ কথা বিনা-দ্বিধায় বলা চলে যে, 'মানুষ সব সমান' প্রবাদটি মিথ্যা।

অথচ এই সমস্ত বাস্তব তথ্য ও তত্ত্ব জানা সত্ত্বেও আজও মানব সমাজে উক্ত প্রবাদটি প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এই প্রবাদটি ছাড়া অন্য কোন প্রবাদ তো এরূপ বাস্তবতার বিপরীত নয়। আর প্রবাদ মূলতঃ অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায় অতিক্রম করে বাস্তবরূপ পরিগ্রহণ করে। তাহলে উক্ত প্রবাদটি কি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায় অতিক্রম ছাড়াই সমাজ স্বীকৃতি পেয়েছে? বিষয়টি একটু গভীরে তলিয়ে দেখা প্রয়োজন।

'মানুষ সব সমান'—প্রবাদটি মিথ্যা নয়। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মানুষ সৃষ্টির নির্ধারিত উদ্দেশ্যে, লক্ষ্য, কর্ম পদ্ধতি ও পরিনতির মধ্যেই মূলতঃ 'মানুষ সব সমান' প্রবাদটির বাস্তবরূপ নিহিত। তাই বৈচিত্রতাপূণ মানুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ বা উপায় হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মোতাবেক কর্ম পদ্ধতি অবলম্বনে।

বস্তুতঃ এই কারণেই 'মানুষ সব সমান' প্রবাদটি শর্ত সাপেক্ষ। সে শর্ত মোট তিনটি। যেমন—প্রথমতঃ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক কর্তৃক নির্ধারিত মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন। দ্বিতীয়তঃ উদিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছার আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন। তৃতীয়তঃ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মোতাবেক নির্ধারিত কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা বা না করার পরিনতির প্রতি প্রত্যয়বোধ জাগ্রত করা ।রাখা। কার্যতঃ শর্ত তিনটি পূরণের মধ্যেই এহেন বৈচিত্রতাপূর্ণ মানুষের

মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এতদ্ব্যতীত বৈচিত্রতা পূর্ণ মানুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

উপরে বর্ণিত শর্ত তিনটি পরিষ্কার সম্পর্কযুক্ত। তাই কোনটিকে কোনটি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে রাখা বা ভাবা সম্ভব না এবং তা করা হলে তদ্বারা সাম্য প্রতিষ্ঠার পথ চির রুদ্ধ। বিষয়টির সহজবোধ গণ্য করার জন্য শর্ত তিনটি সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা গেল।

প্রথম শর্ত ঃ- সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক কর্তৃক নির্ধারিত মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন ঃ

এই বিশ্ব জাহানের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এক-মাত্র আল্লাহ পাক। আল্লাহ পাক এক বিশেষ উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে উদ্দেশ্য ছাড়া কিছুই নেই। এই বিশ্ব জাহানের সকল কিছু সৃষ্টির মূলে রয়েছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিঃশর্ত আনুগত্য বা দাসত্ব। লক্ষ্য-সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে নিঃশর্ত আনুগত্য বা দাসত্বের মাধ্যমে খুশী বা রাজী করা।

মানুষ ও জ্বীন জাতি ছাড়া আর সকল সৃষ্টিই আল্লাহকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী নিঃশর্তভাবে আনুগত্য বা দাসত্ব করার মাধ্যমে তাঁকে রাজী-খুশী করছে। কিন্তু মানুষ ও জ্বীন জাতির মধ্যে ব্যতিক্রম হবার কারণ একটি। আল্লাহ পাক তাকে দাসত্বের মাধ্যমে রাজী-খুশী করার ব্যাপারে তাদেরকে একটু সীমিত স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। বস্তুতঃ এই কারণেই এ দু'টি জাতির মধ্যে একটু ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়।

আজ সাম্য বা অসাম্যের কথা আসত না যদি আল্লাহর আনুগত্যের বা দাসত্বের ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীনতা না দেয়া হত। আজ আমরা মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তো এমনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি না। কেন না তারা প্রকৃতির আদি থেকে আজ পর্যন্ত একইভাবে চলছে। তাদের আচরণের কোনই পরিবর্তন হয়নি। তাদের রাজ্যে নিঃশর্ত আনুগত্য বাধ্যতা-মূলক। তারা ইচ্ছা করলেও এহেন আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। তাই তাদের রাজ্যে সাম্য সদা বিরাজমান। তারা কারোর অধিকার হরণ করে না, কারোর উপর অত্যাচার করে না, কেউ কারোর সীমা

অতিক্রম করতে পারে না। অথচ বৈচিত্রতা তো তাদের মাঝেও বিদ্যমান।

অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় মানব সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব যদি বৈচিত্রময় অথচ স্বাধীন মানুষগুলো তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মোতাবেক, নিঃশর্ত আনুগত্য করার মাধ্যমে রাজী-খুশী করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়; তাহলেই 'মানুষ সব সমান' প্রবাদটির বাস্তবরূপ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

এতদ্ব্যতীত বৈচিত্রতা পূর্ণ মানুষ স্বাধীনতার কারণে যদি তাদের জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মত অগ্রসর হয়, তাহলে তদ্বারা অসাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অতি স্বাভাবিক। বস্তুতঃ এ জন্যেই মানব সমাজে অসাম্য সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মানুষকে বৈচিত্রতাপূর্ণ গুণ-ক্ষমতা ও স্বাধীনতা প্রদানের মূলে রয়েছে পরীক্ষা। এ পরীক্ষা মূলতঃ আল্লাহর আনুগত্য করা বা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরীক্ষা। এ থেকে স্বভাবতঃই উপলব্ধি করা যায় যে, মানুষের জন্য দু'টো পথ রয়েছে এবং সে দু'টো পথই উন্মুক্ত। একটি আল্লাহর আনুগত্যের অপরটি আল্লাহর আনুগত্যের পরিপন্থী। মানুষ তার দেয়া স্বাধীনতার কারণে, যে কোনটি গ্রহণ করতে পারে।

'মানুষ সব সমান' অর্থাৎ সাম্যের ফলিত রূপ আল্লাহর আনুগত্যে এবং মানুষ সব সমান নয় বা অসাম্যের বীজ আল্লাহর আনুগত্যের বিপরীতে। বস্তুতঃ এই কারণেই 'মানুষ সব সমান' প্রবাদটির সফল প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আল্লাহর আনুগত্য ও আনুগত্যের বিপরীত বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন। এ ছাড়া সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। মূলতঃ এই জ্ঞানের কারণেই মানব সমাজে সাম্য বা অসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছার উপায় বা পথ ঃ

কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রয়োজন সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যানুকূল পদ্ধতি বা পথ অবলম্বন। আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার আনুগত্য বা দাসত্ব করার উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে এবং এক বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানুষকে সে সম্পর্কে জ্ঞান দানের ব্যবস্থাও করেছেন।

আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে পরীক্ষা করতে চান বিধায় নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্তার ভূমিকা পালন করেন। এই কারণেই আল্লাহ পাক নিজে প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বক্তৃতা বা বিবৃতির মাধ্যমে তা জানান না। আল্লাহ পাক এ কাজটি করেন তাঁর মনোনীত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে। এই ব্যক্তিবর্গের নাম নবী বা রাসূল। এই নবী বা রাসূলগণ দুনিয়াতে এসে আল্লাহর আনুগত্যের বিধান প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে মানব সমাজে এক অভাবনীয় সাম্য প্রতিষ্ঠায় ব্রত হন।

সর্ব প্রথম মানুষ যিনি তিনিই হলেন আল্লাহর নবী। প্রথম মানুষ ও নবী হযরত আদম (আঃ) এই পৃথিবীতে অবতরণ ক্ষণ থেকেই মানব সমাজে 'মানুষ সব সমান'—প্রবাদটি প্রচলিত। এই প্রবাদটির ফলিত রূপ বেশ কিছু কাল যাবত মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু যখনই মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে ভিন্নরীতি গ্রহণ করতে শুরু করল তখন থেকেই উক্ত প্রবাদটির যথার্থ রূপের পদস্খলন ঘটল।

মানুষ আল্লাহ পাকের প্রিয় সৃষ্টি। তিনি চান না যে, মানুষ ভ্রান্তির পথ অবলম্বন করতঃ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে শাস্তি ভোগ করুক। তাই তিনি মানুষের প্রতিটা পদস্খলন পর্বে নবী বা রাসূল প্রেরণ করেছেন। উক্ত নবী বা রাসূলগণ মানব জাতিকে আল্লাহর আনুগত্যের দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হয়েছেন। বস্তুতঃ এ কারণেই প্রতিটা নবী বা রাসূলের কালকে সাম্যের কাল বলা হয়ে থাকে।

আল্লাহ পাক এই সাম্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনাকে শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মাধ্যমে পরিপূর্ণ করতঃ পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। পৃথিবীতে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। তাই শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ বিধান আল-কোরআন ও রাসূলের হাদিসই হলো মানব সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম।

আল-কোরআন ও হাদিসের বাণী সম্বলিত বিধানই হলো আল-ইসলাম। ইসলামে পরিবেশিত তথা উপস্থাপিত সাম্যের স্বরূপ সামঞ্জস্য পূর্ণ ও শৃংখলামূলক। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিসমূহের মাঝে এক

সুন্দর সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পারিবারিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত সাম্য প্রতিষ্ঠায় পারদর্শী।

মানুষ একাধিক পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তির আঁধার। যেমন অহংরোধ, পরার্থীতা, আবেগ-অনুভূতি, কামবোধ, জৈবিক প্রবণতা, মননশীলতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত প্রবৃত্তিগুলোর যে কোন একটির অতিরিক্ত অনুশীলন দ্বারা মানব জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। তাই এই সমস্ত প্রবৃত্তিগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন করতে হয়। ইসলাম মানুষের প্রতিটা প্রবৃত্তিকে এমন অনুশীলন শিক্ষা দেয়; যা দ্বারা জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ইসলামের সাম্য কেবল মাত্র মানুষের বাহ্যিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। উহার পরিসীমা মানুষের অন্তর পর্যন্ত প্রসারিত। ইসলাম চায় মানুষের অন্তর চেনার জগতে খোদার আনুগত্যের প্রভাব বিস্তার ঘটিয়ে সত্যিকার সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে।

ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তিগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক জীবনে বিচিত্র মানুষের মাঝে এক ভারসাম্যমূলক তথা সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই ইসলামী বিধানে মানব জীবনের কোন দিক ও বিভাগ বাদ পড়েনি যে, যেই বিভাগ অন্যান্য বিভাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অসাম্য সৃষ্টি করতে পারে।

বস্তুতঃ এই কারণেই বলা হয় যে, মানুষ তার জীবনের যে বিভাগ থেকে ইসলামী বিধান বর্জন বা বাদ দিয়েছে সেই বিভাগেই ধ্বংস নেমে এসেছে। অর্থাৎ ইসলামের বিধান মানব জীবনে যতখানি লংঘন করা হয় ঠিক তত খানিক তার ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক জীবনে অসাম্য সৃষ্টি হয়ে থাকে।

একটু চিন্তা করলে অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, 'মানুষ সব সমান' প্রবাদটির বিরোধী নীতি কোথায় নিহিত। যখনই মানুষ আল্লাহর আনুগত্যের বিধান ইসলামকে বর্জন করে নিজের কিংবা অনোর মনগড়া বিধান মোতাবেক জীবন যাপনে তৎপর হয়েছে, তখনই মানুষ সব সমান প্রবাদটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে।

অতএব এই কারণেই সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী বিধানের অকৃত্রিম অনুশীলন অপরিহার্য। এই বিধান ছাড়া আর কোন বিধান নেই যে তদ্বারা মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে, যার মধ্যে সত্যিকার সাম্য নিহিত।

তৃতীয় শর্ত ঃ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছার একমাত্র বিধান বা পথ ইসলাম মানা বা না মানার পরিণতি ঃ

আগেই আলোচনা করেছি মানুষকে আল্লাহ পাক তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে পরীক্ষার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে আল্লাহর আনুগত্যের উপর মুহূর্ত পরম্পরায় পরীক্ষা দিচ্ছে। এই পরীক্ষার ফলাফলই হলো মানুষের সঠিক পরিণতি পর্ব।

মানুষের জীবনে কাল তিনটি। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অতীতে আল্লাহ পাক সব কিছু সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং এই অতীতেই মানুষ প্রতিজ্ঞা করে এসেছে যে সে এই পৃথিবীতে এসে কেবলমাত্র আল্লাহকেই আনুগত্য করবে, অন্য কাউকে না।

বর্তমান সেই অতীতে প্রদত্ত ওয়াদা ভিত্তিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন পর্ব এবং এই পর্বেই তার পরীক্ষার কর্মকাণ্ড চলছে। অর্থাৎ মানুষ পরীক্ষা দিচ্ছে। বলতে কি, এ পরীক্ষা হলো সাম্য ও অসাম্যের পরীক্ষা। কে কতটুকু আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠা করছে আর কে কতটুকু আল্লাহর আনুগত্য না করার ফলে অসাম্যের ভূমিকা পালন করছে—এরই পরীক্ষা চলছে এখানে।

ভবিষ্যৎ হলো বর্তমান কালে সম্পাদিত ভূমিকার উপর মূল্যায়ন পর তার প্রতিফল দান পর্ব। বর্তমান কালে অর্থাৎ এই পৃথিবীতে অবস্থান কালে ইসলামী বিধানের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য মানদণ্ডে প্রতিটি মানুষকে পরিমাপ করা হবে ভবিষ্যতে অর্থাৎ আখেরাতে। যে ব্যক্তি আনুগত্য করছে সে আল্লাহর নিয়ামত ভরা বালাখানাতে স্থান পাবে; আর যে আল্লাহর আনুগত্যের বি-আচরণ করেছে তার স্থান হবে নরক অর্থাৎ চরম শাস্তির জায়গায়। সুতরাং পরিণতি কারণেই মানুষের জীবনে 'মানুষ সব সমান'

প্রবাদটির অনুশীলন অপরিহার্য। তাই 'মানুষ সব সমান' একটি কথা সর্বস্ব প্রবাদই নয়, বরং উহা অবশ্যই পালনীয় একটি নির্দেশ বটে।

এই পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান

এই পৃথিবীতে কেবলমাত্র মানুষই আল্লাহর প্রতিনিধি। তাই আল্লাহর এই সৃষ্টি রাজ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে আল্লাহর পরেই মানুষের স্থান। এই পৃথিবীতে যা কিছু বিদ্যমান, তা সবই একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ উহা মানুষের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদাজনিত কারণেই মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে এ সবের উপর কর্তৃত্ব করবে, নিরংকুশ কর্তৃত্বের মালিক হিসেবে নয়। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবেই দুনিয়ার পরিচালক, দুনিয়ার কোন কিছুই মানুষের পরিচালক বা কর্তৃত্বকারী হতে পারে না। কেবলমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার মানুষের নেই, থাকতে পারে না। কেননা সে তো পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্ট।

মানুষ আল্লাহর খলিফা হিসেবে আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহর আইন-বিধান কার্যকরী করার দায়িত্ব মানুষের উপর অর্পিত। মানুষ সে দায়িত্ব পালন করবে মানব সমাজে, প্রাকৃতিক রাজ্যে নয়। কেন না প্রাকৃতিক রাজ্যের উপর আল্লাহর আইন যথার্থভাবেই কার্যকর। সেক্ষেত্রে মানুষ কেবলমাত্র আনুকূল্য করবে মাত্র। প্রাকৃতিক রাজ্যের ন্যায় মানব সমাজে আল্লাহর আইন কার্যকর নেই, মানুষ তার দায়িত্ব হিসেবে আল্লাহর আইনকে মানব সমাজে জারী করবে। মানব সমাজের জন্য প্রেরিত আল্লাহর আইনকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে তথায় নিজের ইচ্ছামত কর্তৃত্ব চালানোর কোন অধিকার মানুষের নেই। আল্লাহ কখনও তার নিজ কুদরতে মানব সমাজে মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়াই তাঁর আইন কার্যকর করেন না। আল্লাহ চান নবী ও রাসুলগণের মাধ্যমে আল্লাহর নাজিল করা আইন বিধানের প্রতি মানুষ অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপন করবে, নিজেরা যথাযথ পালন করবে এবং তা সঠিকভাবে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবে। এখানেই মানুষের খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব।

প্রতিনিধিত্বের এই ধারণাই মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার ও অর্থ-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের ভিত্তি। কোরআনে উপস্থাপিত সমাজ দর্শনে সকল

মানুষ এক আদমের সন্তান—আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) এর বংশধর। সকলের দেহে একই আদম ও হাওয়ার রক্তের ধারা প্রবাহমান। মানুষ মানুষে কোনই পার্থক্য নেই। বর্ণ, বংশ, ভাষা ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে মানুষ-মানুষে পার্থক্য সৃষ্টি করার কোনই অধিকার নেই। কারো মর্যাদা যেমন কারো তুলনায় বেশী নয়, তেমনি অধিকারের বেলায়ও কারো চাইতে কারোর বেশী হতে পারে না কেউ পেতে পারে না কারোর উপর অগ্রাধিকার বৈষয়িক কোন কারণে। আল্লাহ বলেন, "সেই আল্লাহই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তোমাদের ভিতর থেকে কাউকে কারুর চাইতে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন, যেনো তোমাদেরকে তিনি যা কিছু দিয়েছেন, তার ভেতর তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারে।" (আল-আনয়াম)

বস্তুতঃ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা তার খলিফা মানুষকে বৈচিত্রময় গুণ ক্ষমতা দিয়েই তার বিন্যাস প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন। উদ্দেশ্য প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ তার স্ব স্ব অবস্থা অনুযায়ী প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করবে। এবং তার ফলেই মানব সমাজে 'মানুষ সব সমান' নীতির বাস্তবরূপ প্রতিষ্ঠিত হবে।

ধন-সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে খেলাফতের দায়িত্ব

মানুষ দুনিয়ার ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে আল্লাহর খলিফা। মানুষের এহেন খেলাফতী দায়িত্ব মানব সমাজে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাতে করে একটি আদম সন্তানও যেন কোন একটি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। যেমন আল্লাহ তাকে তাঁর সার্বভৌমত্ব ও নিরংকুশ কর্তৃত্বের দায়িত্ব পালন করছেন। প্রাকৃতিক জগতে আল্লাহর রুটি-রুজি বণ্টননীতি সর্বাত্মকভাবে কার্যকর। একটি ছোট পিপড়া থেকে বড় বড় জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত প্রত্যেকেই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় রিজিক নিয়মিত পাচ্ছে। কেউ-ই তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না। অতএব মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত খেলাফতী দায়িত্ব পালন করবে সমস্ত মানুষ নির্বিশেষে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় রুটি-রুজি তথা রিজিক বণ্টনের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে।

এ দুনিয়াতে যত নবী-রাসূলগণ এসেছেন, প্রত্যেকেই এ দায়িত্ব পালন করে এক উন্নত আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। কোন নবী-রাসূলই রিজিক

বন্টনের ব্যাপারে শ্রেণী বিভেদ সমর্থন করেননি। তাই বলা চলে অর্থনৈতিক সাম্যের দাওয়াত ও তদনুযায়ী যাবতীয় শোষণ মুক্ত সমাজ কায়েম করাই ছিল সকল নবী রাসূলগণের দায়িত্ব। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ২৩ বছরের নবুওয়াতী জিন্দেগীতে এমন এক অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার নজীর ইতিহাসে বিরল।

মানুষ তথা বিশ্বের সমগ্র প্রাণীকূলের সুষ্ঠ বিকাশ ধারা প্রকৃতিতে বিন্যাসিত সম্পদের উপর নির্ভরশীল। মানুষ ভিন্ন অন্যান্য প্রাণীর বিকাশ ধারা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ স্বয়তঃ কার্যকর। কিন্তু মানুষের জন্য সুষ্ঠ বিকাশ ধারা সমুন্নত রাখার জন্য মানুষকেই কার্যতঃ প্রকৃতিতে বিন্যাসিত সম্পদ আহরণ ও বন্টন করত তা বজায় রাখতে হয়। এ কাজ মূলতঃ দুটি বিষয় কেন্দ্রিক। যেমন—একটি উৎপাদন অপরটি বন্টন।

উৎপাদন যোগ্যতার দিক থেকে সমাজের মানুষকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। আর সমাজের মানুষের যোগ্যতা নির্ভর সামগ্রিক মান ও পরিমাণই সেই সমাজের বৈষয়িক অগ্রগতির মানদণ্ড। অর্জন বা উৎপাদন ক্ষমতার দিক দিয়ে সমাজের মানুষকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন —(ক) প্রয়োজন-অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষম ব্যক্তি (খ) প্রয়োজন-অনুগ উৎপাদন ক্ষম ব্যক্তি ও (গ) প্রয়োজনের তুলনায় কম উৎপাদনকারী ব্যক্তি। এই তিন শ্রেণীর সামগ্রিক উৎপাদনের মান পরিমানের উপর সেই সমাজের সামগ্রিক চাহিদা পূরণ নির্ভরশীল।

উৎপাদনের কার্যক্রম ধারা মানুষের বৈচিত্রতাপূর্ণ গুণ-ক্ষমতা-যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। তাই যোগ্যতার ভিন্নতার উপর উৎপাদনের মান পরিমানও ভিন্নতর হয়ে থাকে।

এখন সমস্যা কিভাবে সমাজের বৈচিত্রময় মানুষের চাহিদা উৎপাদিত সম্পদ দ্বারা পূরণ সম্ভব। এটাই হলো বন্টন সমস্যা। আর এহেন বন্টন সমস্যা মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব এ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সমাধান করবে।

একটি উদাহরণ ঃ

একটি সমাজে মনে করি ক, খ ও গ নামে তিনজন লোক বাস করে।

তাদের প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুযায়ী উৎপাদন ক্ষমতা টাকার পরিমানে যথাক্রমে ১০০০, ৬০০ ও ২০০ টাকা। অথচ এই ৩ জনের প্রয়োজন যথাক্রমে ৭০০, ৬০০ ও ৫০০ টাকা।

এখানে দেখা যাচ্ছে 'ক' তার প্রয়োজনের তুলনায় (১০০০–৭০০) ৩০০ টাকা অতিরিক্ত উৎপাদনে সক্ষম। 'খ' তার প্রয়োজননুগ উৎপাদনে সক্ষম ; অর্থাৎ তার যা প্রয়োজন সে তাই উৎপাদন করছে। পক্ষান্তরে 'গ' তার যোগ্যতা অনুযায়ী মাত্র ২০০ টাকা উৎপাদন করতে পারে, অথচ তার প্রয়োজন ৫০০ টাকা। অবশিষ্ট (৫০০–২০০) ৩০০ টাকা তার নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে ঐ সমাজের সদস্য তার প্রয়োজনের অধিক ৩০০ টাকা উপার্জন করেছে ; যা তার কোনই প্রয়োজন নেই। এখন 'ক' এই অতিরিক্ত ৩০০ টাকা যদি 'গ' কে প্রদান করে তাহলে 'গ' এর প্রয়োজন পূরণ করতঃ স্বাভাবিক জীবন যাপন সম্ভবপর হতে পারে। বস্তুতঃ 'ক' তার অতিরিক্ত ৩০০ টাকা অবশ্যই 'গ' কে প্রদান করতে হবে। কেননা ঐ সমাজের প্রত্যেকেই আল্লাহর প্রতিনিধি। তাই 'ক' তার অতিরিক্তের মালিক নয়, মালিক 'গ'। এটাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ বন্টনে খলিফার দায়িত্ব। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

প্রকৃতিতে বাস্তবিক পক্ষে সম্পদের কোন অভাব নেই। বস্তু নিরপেক্ষভাবে গবেষণা করলে দেখা যায় যে একটি সমাজে বৈচিত্রগুণ ক্ষমতার মানুষগুলো তাদের উৎপাদিত সম্পদসমূহ দ্বারা সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট। কিন্তু এর গতি প্রকৃতি নির্ভর করে বন্টন নীতির উপর। সমাজে প্রচলিত নীতি অনুযায়ী সমাজের বস্তুগত ও অবস্তুগত উপকরণসমূহ বন্টিত হয়ে থাকে।

বর্তমান বিশ্বে বস্তুগত ও অবস্তুগত উপকরণসমূহ তিনটি প্রধানতম নীতি বা বিধান কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ইসলাম ছাড়া অবশিষ্ট দুটি বাতিল অর্থাৎ অসাম্যের বিধান। পরবর্তী অধ্যায়ে বিধান তিনটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাম্যের মূলনীতি ঃ – ইসলাম

একমাত্র ইসলামই সাম্যের বিধান। ইসলাম মানুষের বৈচিত্রময় জ্ঞান ক্ষমতার মাঝে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠায় পারদর্শী। ইসলাম মানুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে এক শ্বাশত, সার্বজনীন, সত্যকেন্দ্রিক ধারণা পেশ করে, তদনুযায়ী সাম্য প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞ।

ইসলামে সাম্যের মূলনীতি নেই 'কোন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া'। মাধ্যম হলো রাসুল, মানদণ্ড আল-কোরআন এবং প্রেরণা হলো আখেরাত। বস্তুতঃ ইসলামের সাম্য আল্লাহ, রাসুল, কেতাব ও আখেরাত নামক মৌলিক আকীদাসমূহে বিশ্বাস বা ঈমান এবং তদনুযায়ী বাস্তব কর্মকাণ্ড সম্প্রাদন। তাই ইসলামে সাম্য প্রতিষ্ঠায় ঈমানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঈমান হলো এই সমস্ত মৌলিক আকীদাসমূহকে চিন্তা ধারাতে এমনভাবে মজবুত ও নিশ্চিত করে এমন চরিত্রের বিকাশ ঘটানো, যা দ্বারা বাস্তব জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড ঠিক সেই অনুযায়ীই সম্পাদিত হয়।

আল্লাহর প্রতি ঈমানই হলো ইসলামী সাম্যের মূলনীতি। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো—মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে কালেমা 'লাইলাহা ইল্লালাহ' ঘোষণা করা। এই ঘোষণার প্রভাব অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘোষণাকারীর আবেগ, অনুভূতি, ধ্যান ধারণা, চিন্তা কল্পনা, মত বিশ্বাস ও কাজ কর্মে পড়বে। এই ঘোষণা দিবার পর সে আর কাউকে 'ইলাহ' হিসেবে স্বীকার করতে পারবে না, একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া। তা'হলে ইসলামী সাম্যে 'ইলাহ' শব্দটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'ইলাহ' আরবী শব্দ। বাংলায় উহার অর্থ হলো চালক, নায়ক, বিপদ থেকে হেফাজতকারী, অভাব পূরণকারী, কল্যাণ অকল্যাণ দানকারী, প্রাকৃতিক অতি প্রাকৃতিক অথরিটি যিনি সমস্ত ক্ষমতার একজন অধিপতি।

বস্তুতঃ এমন সত্বাই ইলাহ হতে পারেন যিনি বে-নিয়াজ, নিরপেক্ষ, আত্ম নির্ভরশীল ও চিরঞ্জীব, যিনি চিরদিন ধরে আছেন এবং চিরদিন ধরে

থাকবেন, যিনি একচ্ছত্র শাসক ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান, যার জ্ঞান সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, যার রহমত ও অনুগ্রহ সবার জন্য প্রসারিত, যার শক্তি সবার উপরে বিজয়ী যার হিকমত ও বুদ্ধিমত্তায় কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, যার আদল ও ইনছাফে জুলুমের বিন্দুমাত্র স্থান নেই, যিনি জীবনদাতা এবং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহকারী, যিনি ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতির যাবতীয় শক্তির অধিকারী যার অনুগ্রহ ও হেফাজতের সবাই মুখাপেক্ষী, যার দিকেই সকল বস্তুর প্রত্যাবর্তন, যিনি সবার হিসাব গ্রহণকারী, শাস্তি ও পুরস্কার দানের একমাত্র মালিক। পরন্তু খোদায়ী সংক্রান্ত এ গুণাবলী অবিভাজ্য বা অখণ্ডনীয়, ফলে একই সময়ে একাধিক খোদা থাকবেন এবং তারা উল্লেখিত গুণরাজী কিংবা তার একটি অংশ দ্বারা গুণান্বিত হবেন, অথবা এ কোন সাময়িক এবং কালগত ব্যাপারও নয় যে, একজন খোদা কখনও এইগুলো দ্বারা গুণান্বিত হবেন, আবার কখনও হবেন না, কিংবা এ কোন স্থানান্তর যোগ্য জিনিসও নয় যে, আজ একজন খোদার মধ্যে এর অস্তিত্ব দেখা যায়, আবার কাল দেখা যায় অন্য আর একজনের মধ্যে।

একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত বিশ্ব প্রকৃতির সকল বস্তু ও শক্তি নিচয়ের মধ্যে কোন একটির প্রতিও এ অর্থ প্রয়োগ সঙ্গত হতে পারে না। কেন না বিশ্বের সকল সৃষ্ট বস্তুই অন্য নির্ভর, পরাধীন ও ধ্বংসশীল। তাদের পক্ষে অন্যের উপকার বা অপকারী হওয়া তো দূরের কথা, তারা খোদ নিজের থেকে অপকারিতা দূর করতেও সমর্থ নয়। কাজেই পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই, যার ভিতর প্রভুত্বের বিন্দুমাত্র যোগ্যতা আছে, যে মানুষের গোলামী বা আনুগত্য পাবার অধিকারী হতে পারে।

এহেন অস্বীকৃতির পর যে খোদায়ীকে একটি মাত্র সত্তার জন্যে সুনির্দিষ্ট করে দেয়, যার নাম হচ্ছে আল্লাহ। এই আল্লাহই হলেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র। পৃথিবীর কোন সার্বভৌমত্ব, নেতৃত্ব কর্তৃত্ব এর অংশীদার নয়, হতে পারে না। তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিজিক দাতা আইনদাতা, বিধানদাতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের একমাত্র মালিক প্রভু। সুতরাং এ বিশ্বজাহানের তিনিই একমাত্র পরিচালক। সেহেতু তিনিই এ বিশ্বজাহানের সব কিছুর নির্দেশদাতা ও আইন প্রণেতা। তাই কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর নির্দেশের অনুমোদন ছাড়াই কাউকে আনুগত্যের যোগ্য মনে করে, তা প্রকাশ্য

জুলুম ছাড়া বৈ কি। তার জুলুমের শাস্তি কঠোর। সুতরাং আনুগত্যের ব্যাপারে কেউ আল্লাহর শরীক হতে পারে না। বস্তুতঃ এটাই হল সাম্যের মূলনীতি।

বাস্তবতার আলোকে দেখা যায় মানুষ সাম্যের দাবীতে যখনই আল্লাহর আনুগত্য মেনে নিয়ে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সে মোতাবেক অনুবর্তন করেছে তখনই সাম্য পেয়েছে এবং যখনই আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে অন্য কাউকে আনুগত্য—হোক সে মানুষ কিংবা শয়তান—করেছে তখনই তাদের জীবনে নেমে এসেছে চরম অসাম্য—ইতিহাস তার সাক্ষী। পৃথিবীর যে দেশে বা সমাজে আনুগত্য, প্রভুত্ব তথা বিধান রচনার ক্ষমতা মানুষ নিজে হাতে নিয়েছে সে সমাজে অবশ্যম্ভাবীরূপে অসাম্য বা বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়েছে—তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কেন না কোন মানুষ যখন অপর মানুষের সঙ্গে কি সম্পর্ক হবে তা নিরূপণ করার দায়িত্ব পায়, তখন সে অবশ্যম্ভাবীরূপে আনুগত্যের দাবীদার হলে দাস-প্রভু সুলভ বিধানই রচনা করবে। সুতরাং সে বিধান দ্বারা কিভাবে সাম্য আসতে পারে? পৃথিবীতে এমন কেউ কি আছে যে, দেখাতে পারবে, মানব রচিত বিধান দ্বারা একজন মানুষ অপর আর একজন মানুষের আনুগত্য দাবী করেনি যা দ্বারা চরম অসাম্য সেই সমাজে বিরাজমান হয়নি? পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান ইতিহাস তার সাক্ষী।

সাম্যের মূলনীতি স্থানকাল পাত্র ভেদে বর্ণ, বংশ, আকার আকৃতি ভাষা, গোত্র, যোগ্যতা প্রতিভা, মান মর্যাদা প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রত্যেকটা আদম সন্তান তার স্বাধীন বাছাই ক্ষমতা দ্বারা কেবলমাত্র আল্লাহকেই নিঃশর্ত ইবাদাত বা আনুগত্য করবে। এ ব্যাপারে নিজেকে বা অন্য কাউকে প্রভুত্বের দাবীতে অনুগত্য করতে পারবে না। একজন বাদশা যেমন আল্লাহর আনুগত্য করবে অনুরূপ একজন মিসকিন ফকিরও ঠিক তেমনি আল্লাহর আনুগত্য করবে। একজন বাদশা তার মর্জিমত কোন দেশের লোকদের চালাতে পারবে না, অনুরূপ কোন দেশের একটি আদম সন্তানও দেশের বাদশাকে অনুপরিমান আনুগত্য বা তার হুকুম মেনে চলবে না—প্রত্যেকে একই আল্লাহর হুকুম মোতাবেক চলতে হবে।

আর আল্লাহ পাক তাঁর নিরংকুশ আনুগত্য আদায়ের জন্যেই, তদনুযায়ী মানুষের বৈচিত্রময় গুণ ক্ষমতার প্রেক্ষিতে, রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে অধিকার ও কর্তব্যের একমাত্র শাশ্বত, সার্বজনীন মানদণ্ড স্বরূপ কোরআন পাক অবতীর্ণ করেছেন। রাসূলের মাধ্যমে নাজিলকৃত পবিত্র কোরআনই হলো আনুগত্যের মানদণ্ড এবং উক্ত মানদণ্ডই হচ্ছে একমাত্র সাম্যের নিক্তি বা পাল্লা। তাই কোরআনকে আল্লাহ মিজানও বলেছেন। এ পবিত্র কোরআন দ্বারা ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা, সাম্য অসাম্য যাচাই বাছাই, মাপ পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

পৃথিবীতে অবস্থান কালে কোন আদম সন্তান কতটুকু অধিকার ভোগ করল, তার প্রাপ্যের অধিক না বেশী, তা এই কালাম এ-পাক দ্বারাই নিরূপিত হয়। কেননা কেউই তার প্রাপ্য অধিকারের বেশী কম করতে পারবে না। ঠিক সমান সমান করতে হবে—এটাই সাম্য। কিন্তু যদি কম বেশী করে এবং এখানে তা যদি মানদণ্ড অনুযায়ী ফয়সালা করা না হয়, তাহলে সেখানে অনিবার্যভাবে অসাম্য আসবেই।

অধিকার ও কর্তব্যের সাম্যানুগ মানদণ্ড অনুযায়ী, পরিমাপ এই পৃথিবী-তেই হওয়া উচিৎ; কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে উহার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আগেই বলেছি ইসলামের সাম্য পরিণাম দর্শী। আর এই জন্যেই আদালতে-আখেরাত। এই পার্থক্য জীবনের অধিকার ও কর্তব্যের অনুশীলন মানদণ্ড অনুযায়ী পরিচালিত না হলে রয়েছে প্রচণ্ড শাস্তি, যা ভাষাতীত ব্যাপার, আর মানদণ্ড অনুযায়ী অনুশীলন করলে রয়েছে অফুরন্ত নিয়ামত ভরা বালাখানা- বেহেস্ত এবং তা প্রাপ্তিকাল আখেরাত। তাই বলা হয়েছে ইহকাল হচ্ছে আখেরাতের ক্ষেত। যে যা এখানে যেভাবে আবাদ করবে আখেরাতে গিয়ে সে তা তদরূপই পেয়ে যাবে।

আল্লাহ পাক রাসূলের মাধ্যমে সাম্যের যে মানদণ্ড পৃথিবীর মানুষের মাঝে পাঠিয়ে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন—এটাই প্রকৃতি সাম্য—তা কেমন ধরণের বা প্রকৃতির? এখন আমরা সেটাই আলোচনা করব।

ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক, সামঞ্জস্যপূর্ণ, সাম্য নির্ভর একটি মাত্র মানবীয় জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা আইনের শাসন কেন্দ্রিক।

আইনের শাসনের ক্ষেত্রে দু'টি দিক বিদ্যমান। একটি অপরিহার্যভাবে পালনীয়, অপরটি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

আইনের শাসনের ক্ষেত্রে এ'দুটি দিক যে কেমন সাম্য নির্ভর তা নিম্নোক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায়। মানুষের সৃষ্টি প্রকৃতি অনুযায়ী 'মানুষ সব সমান' প্রবাদটির বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হলে প্রয়োজন, বস্তু নিরপেক্ষভাবে নিম্নবর্ণিত উপায়ে মানুষ আচরণকে গঠণ করা। তাহলে—

১। কল্যাণ কামনা ঃ

সাম্য প্রতিষ্টার অন্যতম মৌলিক উপাদান মানুষের মাঝে পারস্পরিক কল্যাণ কামনা। কল্যাণ কামনা এমন একটা গুণ, যাদ্বারা মানুষ তার ভাই-এর কল্যাণ ও মঙ্গল চিন্তায় প্রতিনিয়ত প্রভাবান্বিত থাকে তারই কল্যাণ তথা মঙ্গল সাধনের জন্য সদা উৎপ্রীরণাকে এবং তারই উপকার সাধনের জন্য সদা থাকে সচেষ্ট। আর এই কল্যাণ কামনার মানদণ্ড হচ্ছে যে মানুষ তার নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, তার অপর ভাই-এর জন্যও ঠিক তাই পছন্দ করবে। কেননা মানুষ কখনও তার আপন সত্ত্বার অকল্যাণ কামনা করে না। সুতরাং যদি সে নিজের জন্য অকল্যাণ কামনা করতে না পারে, তবে সে কিভাবে অপরের জন্য অকল্যাণ কামনা করবে ?

এই প্রসঙ্গে ইসলামের নির্দেশ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছল ও স্বাশত। রাসুল (সঃ) বলেন "যে মহান সত্ত্বার হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ, তার কসম, কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তার ভাই-এর জন্যও তাই পছন্দ করবে"। কল্যাণ কামনা এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের অধিকার ও কর্তব্য। সুতরাং কল্যাণের জন্য কল্যাণ কামনা অপরিহার্য। আর এইরূপ নিঃস্বার্থ কল্যাণ কামনাই সাম্যের অন্যতম মৌলিক উপাদান। কল্যাণ কামনা ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, সমাজে-সমাজে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে হতে পারে এবং উহা দু'টি পর্বে বিভক্ত। একটি ইহকালের ক্ষেত্রে অপরটি পরকালের পর্যায়ে। জীবিত মানুষেরা নিজেদের মধ্যে কল্যাণ কামনা করবে এবং সেই সাথে তাদের আগে এই ধরা ধাম থেকে বিদায় নিয়েছে, এমন ভাইদের জন্যও কল্যাণ কামনা করবে, যাদ্বারা পরকালীন জীবনে সে আল্লাহর আজাব

থেকে মুক্তি পেতে পারে। কার্যতঃ অতীত লোকদের জন্য কল্যাণ কামনার প্রকৃতি তাদের কৃত কর্মকাণ্ডের উপরই নির্ভরশীল। অতীতের লোকেরা যদি ক্ষতিকর বা অকল্যাণকর কিছু করে গিয়ে থাকে, যার প্রতিক্রিয়া বর্তমান সমাজের লোকেরা সমভাবে উপলব্ধি বা ভোগ করছে, তাহলে সেখানে কল্যাণ কামনা তো দূরের কথা, তদ্দারা বদদোয়াই করে থাকবে বেশী। আর এর প্রতিক্রিয়া পরকালের জীবনে সমভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ভাল-মন্দ, বন্ধু-শত্রুর প্রকাশ অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর পরেই মানব সমাজে হয়ে থাকে। পৃথিবীর জীবনে জোর করে কল্যাণ কামনা আদায় করা যেতে পারে কিন্তু মৃত্যুর পরের জীবনে নয়। হিটলারের জীবদ্দশায় অনেকেই অনিচ্ছায় প্রাণের ভয়ে তার সামনে তার কল্যাণ কামনা করছে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর কেমন অকল্যাণ কামনা করেছে তার সাক্ষী এই পৃথিবীর ইতিহাস। সুতরাং ইসলামের কল্যাণ কামনা উভয় জগতের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন রাসুল (সঃ) ও তাঁর সাহাবাদের জন্য বর্তমান বিশ্বের মানুষ কল্যাণ কামনা করছে।

ইসলামের ইতিহাস ঘাটতে গেলে দেখা যে, মুসলমানদের প্রতিটা ক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি অকৃত্রিম কল্যাণ কামনায় ভরপুর। যেমন দু'একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইরাকের জায়গীরদারগণ মুসলিম সেনাপতি হযরত আবু ওবায়দার (রাঃ) সাথে সন্ধিযুক্ত স্থাপন করে। এই খুশীতে কোন কোন জায়গীরদার নানা ধরণের সুস্বাদু খাবার নিয়ে মুসলিম সেনাকে দিলে তা তিনি গ্রহণ করেননি, কেননা অনুরূপ খানা অন্যান্য সেনাদের জন্য প্রদান করা হয়েছিল না। একজন সেনাপতি তার স্থান এবং সাধারণ সৈনিকের স্থান সেনাবাহীনীতে কোথায়? বর্তমান বিশ্বে এদের সম্পর্ক প্রায় দাস-প্রভুতুল্য। অথচ ইসলামে সব সমান। এ উদাহরণ তার প্রমাণ মিলে।

বৈচিত্রময় গুণ-ক্ষমতার অধিকারী মানুষ সমাজ জীবনে বসবাসের ক্ষেত্রে পরস্পর নির্ভরশীল। এরূপ অবস্থার ক্ষেত্রে পরস্পর কল্যাণ কামনা ছাড়া। স্বস্ব স্বার্থের অনুশীলন দ্বারা সাম্য আদৌ সম্ভব না। তাই ইসলাম পরস্পর কল্যাণ কামনার এক সুস্পষ্ট মানদণ্ড তথা মিজান রাসুল (সঃ)

এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে তদনুযায়ী চলার মাধ্যমে সাম্য পাবার নির্দেশ দান করেছেন। রাসুল (সঃ) এর জীবনের কোথাও পরস্পর কল্যাণ কামনা ছাড়া অন্য কিছু পরিদৃষ্ট হয়নি। ধন-সম্পদ, খাদ-খাবার, পোশাক-আশাক, বিচার-আচার প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে—পারিবারিক, সমাজে, রাষ্ট্রে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কল্যাণের সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছেন।

বিশ্ব জাহানের নবী (সঃ) হয়ে কখনও নিজেকে কোন কিছুর পাবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেননি। পৃথিবীতে এমন কোন নর-নারী আছে কি রাসুল (সঃ) অসাম্যবাদী বলতে পারে? নিঃসন্দেহে রাসুল (সঃ) সাম্যের উজ্জল নক্ষত্র, একমাত্র দিশারী ও অতুলনীয় আদর্শ। আর যাঁরা রাসুল (সঃ) এর সংস্পর্শে এসেছেন তারাও একই আলোয় আলোকিত হয়ে নিজেদের কথা সমাজকে এক সাম্যের অবতার হিসেবে গড়ে তুলেছেন। হযরত ওমর কোন দুঃভিক্ষের সময়ে ভাল খাবার খেতেন না। তিনি তার প্রজাদের অবস্থা স্বচোক্ষে দেখার জন্যে রাত্রে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন এ সবই কল্যাণ কামনার নজীর।

বর্তমান বিশ্বে আমরা যারাই সাম্য চাইব তাদের প্রত্যেকেই অনুরূপ হতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সাম্য চাচ্ছি, অথচ পরস্পরের কল্যাণ কামনা দূরের কথা বরং তার বিপরীত নীতির অনুশীলন করছি। যার জন্যে আমাদের দেশে সাম্যের আশা সুদূর পরাহত।

২। আত্মত্যাগ ঃ

একজন মুসলমান যখন তার ভাই-এর জন্যে শুধুমাত্র নিজের মতোই পছন্দ করে না, বরং তাকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়, তখন তার এই গুণটিকেই বলা হয় আত্মত্যাগ। সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য এটি দ্বিতীয় অন্যতম মৌলগুণ।

ইসলাম মানুষের মাঝে এমনই ধরণের গুণাবলীর সমাবেশ ঘটাতে চায়, যাদ্বারা সত্যিকার সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে উঠে।

আত্মত্যাগ স্বভাব-প্রকৃতির ক্ষেত্রে হওয়া উচিৎ। কেননা মানুষ স্বভাবতই বিভিন্ন প্রকৃতির, তাই তাদের ইচ্ছা ও চাহিদাও ভিন্নরূপ। এহেনবস্থাতে

মানুষ যদি তার প্রকৃতির চাহিদার উপর অনড় হয়ে থাকে, তাহলে তো মানব সমাজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে বাধ্য। পক্ষান্তরে সে যদি অন্যের রুচি, পছন্দ, ঝোক, প্রবণতাকে অগ্রাধিকার দিতে শিখে তাহলেই না অত্যন্ত চমৎকার ও হৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে নজীর বিহীন সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

আত্মত্যাগের উচ্চ স্তর হচ্ছে নিজে অভাব-অনাটনের মধ্যে থেকেও আপন ভাই-এর প্রয়োজনকে নিজ প্রয়োজনের আগে অগ্রাধিকার দেয়া। আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) এর জীবন ও সাহাবায়ে কেরামদের জীবন এ ধরণের ঘটনাবলীতে ভরপুর।

কোরআন পাকে মুসলমানদের ঐ গুণটির প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন, "এবং তারা নিজের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা রয়েছে অনাটনের মধ্যে"।

একটি হাদিসে বর্ণিত, একদিন রাসূল (সাঃ) এর নিকট একটি ক্ষুধার্ত লোক এলো। তখন নবী গৃহে কোন খাবার ছিল না। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আজ রাতে এই লোকটিকে মেহমান হিসেবে রাখবে, আল্লাহ তার প্রতি করুণা বর্ষণ করবেন। হযরত আবু তালহা লোকটিকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ঘরে গিয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, ঘরে মেহমানের পেট ভরার মতনই খাবার আছে। তিনি বললেন ছেলে-মেয়েদেরকে খাওয়ায়ে বাতি নিভিয়ে দাও। আমরা উভয়েই আজ রাতে অভুক্ত থাকব। অবশ্য মেহমান বুঝতে পারবে যে, আমরাও খাচ্ছি। অবশেষে তারা তাই করলেন। সকালে রসূল (সাঃ) এর খেদমতে হাজির হলে তিনি বললেন, "আল্লাহ তায়ালা তোমার এই আচরণে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন"।

এ তো শুধু আর্থিক অনাটনের মধ্যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত। কিন্তু এর চাইতেও চমৎকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এক জিহাদে, যাকে আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা বলা যায়। ঘটনাটি হলো ঃ যুদ্ধের ময়দানে একটি আহত লোকের কাছে পানি নিয়ে যাওয়া হলে। ঠিক সেই মূহূর্তে নিকট থেকে অপর একটি লোকের আর্তনাদ শোনা গেল। প্রথম লোকটি বলল ঃ ঐ লোকটির কাছে আগে নিয়ে যাও। দ্বিতীয় লোকটির কাছে গিয়ে পৌছিলে আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো এবং সেই মুমূর্ষবস্থায়ও লোকটি নিজের

সঙ্গীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিল। এইভাবে ষষ্ঠ ব্যক্তি পর্যন্ত একই অবস্থার অবতারণা ঘটল। কিন্তু ষষ্ঠ ব্যক্তির কাছে গিয়ে দেখা গেল যে, তার প্রাণ প্রদীপ আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ইহকাল ত্যাগ করে পরকালের জগতে চলে গেছে। এরূপ প্রত্যেকেরই ভাগ্যে একই অবস্থার সূত্রপাত ঘটে।

আশ্চর্য! এ কোন ধরণের আত্মত্যাগ! মৃত্যুকালে প্রত্যেকেই যেখানে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতির অন্ধ অনুসরণ করে, আর কিনা এখানে এরূপ দৃষ্টান্ত! কেবলমাত্র মুসলমান ছাড়া পৃথিবীতে আর কে পেরেছে এরূপ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে যেতে। তাহলে একটু চিন্তার বিষয় ইসলাম আত্মত্যাগের মাধ্যমে কেমন ধরণের সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

এরূপ আত্মত্যাগের অনুশীলন ক্ষেত্রে আমরা পুনরায় পূর্বে প্রদত্ত উদাহরণটিতে ফিরে আসতে চায়।

ক, খ ও গ যুগপৎভাবে আয় করে, ১০০০, ৬০০ ও ২০০ টাকা। কিন্তু তাদের প্রয়োজন যথাক্রমে ৭০০, ৬০০ ও ৫০০ টাকা। এখানে তিনজনের মোট উৎপাদন বা আয় ও প্রয়োজন অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ক তার প্রয়োজন-তিরিক্ত ৩০০ টাকা উৎপাদন করতে সক্ষম। খ তার প্রয়োজননুগ, কিন্তু গ তার প্রয়োজনের তুলনায় ৩০০ টাকা কম আয় করতে সক্ষম। পুজিবাদী সমাজে 'গ' এর মরণ ছাড়া কোন গতি নেই; কেননা 'ক' এর অতিরিক্তে কারোর কোন অধিকার নেই এবং তা সে দিবেও না। অনুরূপ সমাজতন্ত্রে 'ক' কে তার অতিরিক্তকে যৌথ-সম্পত্তি বলায় সে আর তা উৎপাদনে তৎপর হবে না। ফলে গোটা সমাজকে একসাথে মরা ছাড়া কোন পথ থাকবে না। অথচ ইসলামী বিধান অনুসারে পরস্পরের কল্যাণ কামনা ও আত্মত্যাগ অপরিহার্য মানবীয় গুণাবলী থাকার ফলে কেউ কোন প্রকার দুরবস্থাগ্রস্থ হবে না। এখানে 'ক' তার প্রয়োজনতিরিক্ত ৩০০ টাকা 'গ' এর প্রয়োজনে বিনা বাক্যে নির্দ্বিধায় নূন্যতম আত্ম-সংকোচন ছাড়াই প্রদান করবে। কেননা 'ক' জানে যে সে তার অতিরিক্তের মালিক নয়। আল্লাহ তাকে তার যোগ্যতা অনুসাতে দান করেছেন, যাদের প্রয়োজন তাদের মাঝে দান করে দিবার জন্য।

এখন প্রশ্ন যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রয়োজনতিরিক্ত উৎপাদন না করে, তাহলে দান করবে কিভাবে এবং তখন 'গ' এর কি দশা হবে? ইসলাম এর এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও আশাব্যাঞ্জক জবাব দান করে থাকে। আগেই বলেছি ইসলামের সাম্য একটা পরিণামদর্শী এবং সে পরিণাম আখেরাতের মুক্তি এবং পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত। ইসলাম বলে আল্লাহ তার প্রিয় বান্দার জান ও মালকে জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। ইহকালে যে ব্যক্তি এক আনা দান করবে, পরকালে আল্লাহ তাকে তার বিনিময়ে অ-নে-ক গুণ বেশী বিনিময় দান করবেন। এই যে অনুপ্রেরণা এতদ্বারা প্রতিটা মুসলমানই চাবে অধিক উৎপাদন করে অধিক অধিক আল্লাহর রাস্তায় তারই সৃষ্টি মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিতে। সুতরাং ইসলামে ইচ্ছাকৃত-ভাবে অতিরিক্ত বিলিয়ে দিবার ভয়তে কম উৎপাদনের কোনই আশংকা নেই, যেমনটি কিনা সমাজতন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে।

কল্যাণ কামনান্তে আত্মত্যাগের মাধ্যমে ইসলাম এমন এক মানব গোষ্ঠি সৃষ্টি করতে চায়, যেখানে কেউ কারোর কষ্ট-সহ্য করতে পারবে না। কেননা তাদের সম্পর্ক এত মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন ঃ "মুমিনগণ একদেহ বিশেষ। যদি চোখে আঘাত লাগে, সমস্ত শরীরের ব্যথা অনুভূত হয়, যদি মস্তকে ক্ষত হয়, সমস্ত শরীরেই তা অনুভূত হয়"। আবু মুসা বলেন রাসূল (সঃ) বলেছেন, "মুসলিম সমাজ একটি অট্টালিকার ন্যায়, তার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে"।

বস্তুতঃ যোগ্যতা ও গুণ-ক্ষমতার দিক বৈচিত্রতাপূর্ণ করার মূলে রয়েছে পরীক্ষা। আল্লাহ-চান মানুষ আল্লাহর আদেশ মোতাবেক এই পার্থিব জীবনে চলুক তাহলে 'মানুষ সব সমান' নীতিটি বাস্তবায়িত হবে। আল্লাহ বলেন "তোমাদের নিজের প্রয়োজন অতিরিক্ত সবই অন্যদের প্রয়োজন মিটানোর জন্যে"। (— বাকারা ২১৯ আয়াত)।

আল্লাহ পাক মানুষকে উদ্দেশ্য নির্ভর সাম্য দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সে সাম্য পেতে হলে আল্লাহ বিধান মোতাবেক যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়া অপরিহার্য। আর এই বিধান মানা-না মানার উপরই তার পরীক্ষা। উপরোক্ত আয়াতটি তার প্রমাণ। নিঃসন্দেহে উপরোক্ত

আয়াতটি সাম্য নির্ভর ও সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য তা ছাড়া সমাজ টিকে থাকতে পারে না। এখন মানুষ যদি তা না মানে তাহলে ইহকালে কেমন অবস্থার শিকার হতে হবে তা উপরোক্ত উদাহরণটি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। অতঃপর তো পরকালের চরম শাস্তির ব্যবস্থা তো আছেই যার থেকে ত্রাণ পাবার অনুপরিমান উপায় নেই।

এখন জিজ্ঞাসা ঃ প্রয়োজনতিরিক্ত কিভাবে নির্ধারণ করা যাবে ? এই প্রসঙ্গে মুসলিম শরীফের একটি হাদিস স্মরণযোগ্য। হযরত আবু হোরাইরা বর্ণনা করেন. "রাসূলল্লাহ (সঃ বলেছেন মানুষ বলতে থাকে আমার ধন আমার সম্পদ। অথচ সম্পদের মাত্র তিনটি অংশই সে পেয়ে থাকে। ১। খেয়ে যা কিছু হজম করে ফেলা হয় ; ২। পরিধান করে যা কিছু পুরাতন কিংবা ছিড়ে ফেলা হয় ও ৩। অন্যের প্রতিপালনে ব্যয় করে নিজের পরকালের জন্য যা কিছু সঞ্চয় করে। এই তিন ধরণের সম্পদ ছাড়া যা-ই হোক না কেন. হয় সব চলে যায়, নতুন বা উত্তরাধিকারীদের নিকট ফেলে রেখে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।"

আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূল (সঃ) এর সুন্নত কত বাস্তব সাম্য কেন্দ্রিক. উহা কোন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে সে সমাজে কেমন ধরণের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা সত্যিই চিন্তার, ভাববার ও উপলব্ধির বিষয়।

আগেই বলেছি সাম্য আল্লাহর নিঃশর্ত আনুগত্যে। আনুগত্যের উপায় হলো আল্লাহর বিধান। আর এই বিধানই হলো সাম্যের মাধ্যম। কার্যতঃ আল্লাহর বিধানের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য ভিন্ন সাম্যের আর বিকল্প কোন উপায় নেই, থাকতে পারে না। বস্তুতঃ এই বিধানেরই অংশ পরস্পরের প্রতীক অকৃত্রিম কল্যাণ কামনা এবং তা আত্মত্যাগের মহান ব্রত পালনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা। মূলতঃ সাম্য এখানেই নিহত।

৩। আদল (সুবিচার) ঃ

ইসলামের সাম্য প্রতিষ্টার তৃতীয় মৌল উপাদান বা গুণ হল আদল। আদল অর্থ-সুবিচার। আদল সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে দু'টি মৌলিক তত্ত্ব নিহিত। এক, স্থান কাল-পাত্র ভেদে লোকদের অধিকারের বেলায় সমতা

ও ভারসাম্য বজায় রাখা। দুই, প্রত্যেকের অধিকার স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বুঝিয়ে দেয়া।

ইসলাম প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ধর্মীয়, নৈতিক, তামাদ্দুনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত প্রাপ্য অধিকারকে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত স্বকৃতিদান এবং তদনুযায়ী তা প্রদানে অটল, অবিচল। বস্তুতঃ অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে কখনও ইচ্ছামূলক, কুপরামর্শ বা চাপের মুখে তা থেকে বিরত না থাকাই হলো আদল।

ইসলামী বিধান বা শরীয়ত এ দাবী করে যে, কারোর কাছ থেকে অনিষ্টকারী তার বদলা নিতে হলে যতটুকু অনিষ্ট করা হয়েছে, তত-টুকুই নিবে, যে ব্যক্তি এর অধিক অগ্রসর হলো, সে মূলতঃ সুবিচারের বিরুদ্ধচারণ করল। রাসূল (সঃ) বলেন, "গযবের আস্থা হোক আর সন্তুষ্টির, যে কোন অবস্থায় আদলের বা সুবিচারের বাণীর উপর কায়েম থাকো"।

একবার রাসূল (সাঃ) দরবারে চুরির দায়ে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা বিচারের জন্য আনিত হলো। অনেকেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা ভেবে রাসূল (সঃ) এর নিকট তার দণ্ড হ্রাসের সুপারিশ পেশ করতে লাগল। এমতবস্থায় রাসূল (সঃ) স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন যে, নবী তনায়া ফাতেমাও যদি এরূপ অপরাধ করত, তবে আমি তাকেও হাত কাটার আদেশ দিতাম। তাহলে চিন্তা করুন, কেমন সুবিচারের নজীর নবী (সঃ) দুনিয়াবাসীর জন্য রেখে গেছেন। ইসলামের এহেন সুবিচার পূর্ণ বিচার দেখে অনেক বিধর্ম মুসলমান হয়ে গেছে। বস্তুতঃ ইসলামী বিধান মোতা-বেক যাবতীয় স্বার্থের উর্ধে থেকে নিরপেক্ষভাবে সমস্ত সমস্যার সমাধানেই সাম্য নিহিত। কিন্তু আজ-কাল তা আর তেমন একটা পরিদৃষ্ট হয় না। হেলো হেলো কিংবা পয়সা কড়ির বিনিময়ে হককে না হক, আর না হককে হকে পরিণত করা হচ্ছে। ফলে সমাজে চরম অসাম্য, অশান্তি বিরাজ করছে।

ইসলাম প্রত্যেকের অধিকার স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বুঝিয়ে দিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞ। ইতিহাসে এর নজীর মিলে। হযরত ওমর অর্ধ

পৃথিবীর বাদশা হয়ে আদল প্রতিষ্ঠার জন্য রাত্রি বেলায় ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন হঠাৎ একটি অভুক্ত পরিবারের সন্ধান পেয়ে নিজ কাধে আটা ও চিনি বহন করতঃ সেই পরিবারে পৌঁছিয়ে দেন।

একবার তিনি একজন বৃদ্ধ জিম্মিকে জিজিয়া আদায়ের জন্য ভিক্ষা করতে দেখলেন। তিনি জিম্মিকে প্রশ্ন করলেন, কেন ভিক্ষা করছেন। উত্তরে জিম্মি বলেন মুসলিম সরকারকে জিজিয়া প্রদানের জন্যে।

এ কথা শুনা মাত্রই হযরত ওমর (রাঃ) তার জিজিয়া মাফ করেছেন এবং বায়তুলমাল থেকে তার ভরণ পোষণের নির্দেশ দেন এবং বলেন যেহেতু আমরা তার যৌবনের সম্বলকে ভোগ করেছি, তাই আমাদের উচিৎ তার বৃদ্ধ বয়সের সমুদয় দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা।

আর একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার হযরত ওমর (রাঃ) এর দরবারে এক মূর্তি উপাশক লোকালয়ের একটি মূর্তির নামের কিছু অংশ ভাঙ্গার অভিযোগে বিচার প্রার্থনা করা হলো। হযরত ওমর (রাঃ) তাদেরকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খুজে বের করার জন্য সময় চেয়ে বিলম্ব করতে বলেন। তারা বেশ কয়েক বার হযরত ওমর (রাঃ) এর কথা-মতো বিলম্ব করল বটে, কিন্তু প্রকৃত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খুজে পাওয়া গেল না। অতঃপর তিনি তাদেরকে বললেন, তাদের দেবতার যতখানি নাক ভাঙ্গা হয়েছে, ততখানি তাঁর নাক কেটে দিতে। মুসলিম খলীফার এহেন সুবিচার মূলক আচরণ দেখে উক্ত লোকালয়ের অধিকাংশ বিধর্মীই মুসলমান হয়ে যায়। ইসলাম সুবিচার প্রতিষ্ঠায় সত্যিই এমনিই যত্নবান।

বস্তুতঃ ইসলামের এ্যাপপ্রোসসমূহ মানব সাম্য কেন্দ্রিক। ইসলাম মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক, মনস্তনতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইনসাফ ভিত্তিক বিধান প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞ। তাই ইসলামের সাম্য মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য।

৪। ইহসান (সদাচরণ) ঃ

সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইহসানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আদলকে সাম্য

মূলক সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তি বলা হলে তো ইহসানকে তার সৌন্দর্য ও পূর্ণত্ব বলতে হবে। রাসূল (সঃ) বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি আমা হতে বিচ্ছিন্ন হবে, আমি তার সঙ্গে যুক্ত হব, যে আমাকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে, আমি তাকে তার অধিকার বুঝিয়ে দেব এবং যে আমার উপর জুলুম করবে, আমি তাকে মার্জনা করে দেবো"।

আল্লাহ পাক বলেন, "তারা অন্যায় ও পাপকে ন্যায় ও পূর্ণের দ্বারা নিরাসন করে থাকে"।

রাসূল (সঃ) বলেন, "মুমিন হচ্ছে প্রেম ভালবাসার মূর্ত প্রতীক, যে ব্যক্তি না ভালবাসে, আর না তাকে ভালবাসা হয়, তার ভিতরে কোন কল্যাণ নেই।" তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি কোমল স্বভাব থেকে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত।"

ইহসানের ক্ষেত্রে কোন বয়সের ভেদাভেদ নেই। আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি রহম (স্নেহ) এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

ইহসান দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্ক এমন মধুর হয়ে গড়ে উঠে যাদ্বারা প্রত্যেকেই সাম্যানুভব করতে পারে। কথায় আছে, ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়। এ কথা কোন কোন ক্ষেত্রে সুফল হিসেবে দেখা দেয় বটে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এর ফল শুভ হয় না, বরং বিপরীত হয়ে থাকে। তাই পরিবেশ-পরিস্থিতি ও মানসিক অবস্থার সুবিবেচনান্তে আদল ও ইহসান প্রয়োগ করতে হয়।

ইহসান ব্যবহারিক জীবনে বাস্তব অনুশীলন দ্বারা প্রতিষ্ঠা সম্ভব, আনুষ্ঠানিক ইবাদতে নয়। একটি হাদিস দ্বারা তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—একজন লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট এসে নিবেদন করল, "হে আল্লাহর রাসূল! অমুক স্ত্রী লোকটি তার অধিক নফল নামাজ, অধিক রোজা ও অধিক দান খয়রাতের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে জিব্বা দ্বারা কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 'সে জাহান্নামী হবে।" সে পুনরায় আরজ করল, "হে আল্লাহর রাসূল! অমুক স্ত্রী লোকটির বেলায় এ কথা বলা হয়ে থাকে যে,

সে নফল নামাজ কম পড়ে, নফল রোজা কম রাখে এবং দান খয়রাতের বেলায়ও একটি পরিমিত দান করে অথচ মুখের ভাষা দিয়ে কোন প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। "রাসূল (সঃ) বললেন, "সে জান্নাতী হবে।"

(মিশকাত শরীফ)

ইসলাম মানুষের প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ইহসানমূলক ব্যবহারের নির্দেশ দান করে, যাদ্বারা সামাজিক জীবনে পরস্পরের বসবাস ক্ষেত্রে কোনরূপ অন্যায়-রাড়াবাড়ী, জুলুম বা অসাম্য বা সীমালংঘন না ঘটে এবং এর উপর আদালতে আখেরাতে পরীক্ষায় প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিকট কৃত কর্মের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং এতদ্বারা প্রমাণিত হয় ইসলামের সাম্য নিজের প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার থেকে শুরু করে জীবনের বৃহৎ পরিমণ্ডল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

সর্বোপরি ইসলামের সাম্য শুধু সম্পদ বন্টনের ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়, উহার পরিসীমা মানবতা বিকাশ নুকূল যাবতীয় অধিকার ও কর্তব্য পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এই জীবনের সর্বক্ষেত্রেই, সর্ব উপকরণে আদল ও ইহসান অনুশীলন সত্যিকার সাম্যের জন্য অপরিহার্য। সাম্য হাতে, সাম্য কানে, সাম্য মস্তিষ্কে, সাম্য পায়ে, সাম্য মুখে, সাম্য প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে—প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকা ছাড়া একটি কম অপরটি বেশী হলে, তদ্বারা অসাম্যেরই উন্মেষ ঘটে। যেমন পেট ভরে খেতে দিয়ে বিদায়ের বেলায় কটু কথা শুনায়ে দিলে যেমন হয়—নিঃসন্দেহে এটা সাম্য নয়।

এই প্রসঙ্গে সমাজতন্ত্রের কথাই ধরা যাক। ধরি সমাজতন্ত্র মানুষের পেটের সাম্য প্রতিষ্ঠিত করল বা করতে সমর্থ হলো, কিন্তু মন, কান, হাত, পা-কে রাষ্ট্রীয় মজবুত রশি দ্বারা বেধে রেখে অনেকগুলো শ্রেণীতে বিভক্ত করল বা দাস-প্রভূ সম্পর্ক স্থাপন করল তাহলে কি সত্যিকার সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব ?

পক্ষান্তরে পুঁজিবাদে তো কোন ক্ষেত্রেই সাম্য নেই, অসাম্য ছাড়া না পেটের না মনের না অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের। বস্তুতঃ সত্যিকার সাম্য কেবল মাত্র ইসলামেই নিহিত রয়েছে, যা কিনা অনুশীলনের দাবীদার।

এই পর্যন্ত ইসলামের সাম্য প্রতিষ্ঠার উপাদানসমূহের মধ্যে মোটামুটিভাবে বেশ কয়েকটি আলোচনা করা হয়েছে। যা ছাড়া মানুষের

বৈচিত্রময় গুণ ক্ষমতা ও স্বভাবের ক্ষেত্রে সত্যিকার সাম্য প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব না। এখন আমরা অবশ্যই পরিত্যাজ্যমূলক উপাদানসমূহ নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলাপ করব। আগেই বলেছি ইসলামের সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য দু'টি দিক বিদ্যমান। একটি সদার্থক অপরটি নঞার্থক। উপরের আলোচনাটুকু সম্পূর্ণ সদার্থক ছিল। এখনকার আলোচ্য বিষয় নঞার্থক উপাদানসমূহ।

নঞার্থক বা পরিত্যাজ্য উপাদানসমূহ থেকে বিরত না থাকলে কখনও সত্যিকার সাম্য সম্ভব না। যেমন—

১। কোন মানুষ কোন মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না ঃ

মানুষ সবই আল্লাহর খলিফা। খলিফা হিসেবে প্রত্যেকটা মানুষের অধিকার ও কর্তব্য আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই খলিফা হয়ে কোন মানুষ কোন মানুষের খোদা প্রদত্ত নিঃশর্ত, নিরপেক্ষ অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন, "এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ; অতএব একে কখনও লংঘন করো না। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লংঘন করে সে-ই জালেম।" জালেম অর্থ জুলুমকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লংঘন করল সে নিজের উপর তথা অন্যের উপর চরম জুলুম করল, যার শাস্তি অবর্নীয় তথা অসহ্যকর।

রাসূল (সঃ) বলেন, "যে কছম খেয়ে কোন মুসলমানের হক মেরেছে, আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাকে জাহান্নামকে অনিবার্য এবং জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। ততঃপর সাহাবাদের ভিতর থেকে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন তা যদি কোন মামুলী জিনিষ হয় ? রাসূল (সঃ) বললেন, হ্যাঁ, তা যদি পীলোগাদের একটি অকেজো ও মামুলী ডালও হয়, তবুও।"

আরও একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, "সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তার প্রতিবেশী নিরাপদ নহে।"

সুতরাং এ দ্বারা আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি যে, ইসলাম মানুষের অধিকারকে কিভাবে সংরক্ষণ করতে প্রয়াস পায়, যা ছাড়া সাম্যের কানা-কড়িও মূল্য নেই।

২। দেহ ও মনের ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা দান ঃ

প্রতিটা মানুষের কাছে সব চাইতে প্রিয় ও মূল্যবান হচ্ছে তার দেহ ও মন। এ ব্যাপারে কোন ব্যক্তি অন্যায় আচরণ করবে, সে কখনও অন্যের ভাই হতে পারবে না। কেননা মুসলমানরা সব ভাই ভাই। তাই অন্যায় রক্তপাত থেকে মুসলমানদেরকে নিরাপদ থাকার জন্যে কঠোর ভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার পুরস্কার হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি গযব ও লানৎ বর্ষণ করছেন এবং তার জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন কঠোরতর শাস্তি।" রাসূল (সঃ) বলেন "মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী আর তার সাথে লড়াই করা কুফরী।"

কটু ভাষণ, গালাগালি ও গীবত মানুষের অন্তরে প্রচণ্ড আঘাত সৃষ্টি করে, যাদ্বারা ফেতনা সৃষ্টি হতে পারে, আর ফেতনা সর্বদা অসাম্যের মর্মমূলে শয়তানস্লভ কাজ করে থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "কোন কটু ভাষী ও বদ স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" এবং গীবত সম্পর্কে কোরআন পাকে বর্ণিত আছে," কেউ কারোর গীবত করো না। তোমরা কি আপন মৃদা ভায়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? একে তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করবে।" এখানে গীবত-কে মৃত্যু ভাইএর গোশত খাওয়ার সহিত তুলনা করা হয়েছে।

৩। উপহাস ঃ

যোগ্যতার কম বেশীর কারণে কাউকে উপহাস করা সত্যিই সাম্য পরিপন্থী। ইসলাম তা কখনও পছন্দ করে না। কেননা উপহাস করা মানেই অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং নিজকে শ্রেষ্ঠতর ভাবা। নিঃসন্দেহে উহা সাম্য পরিপন্থী। তাই আল্লাহ পাক বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ, কোন সম্প্রদায় অপর কোন সম্প্রদায়কে ঠাট্টা করো না, সম্ভবতঃ সে তার চাইতে শ্রেষ্ঠ হবে। আর করো না কোন নারীর, অপর কোন নারীকে ঠাট্টা, সম্ভবতঃ সে শ্রেষ্ঠ হবে তার চাইতে।"

৪। তুচ্ছ জ্ঞান করা ঃ

যোগ্যতার কম-বেশীর কারণে কাউকে তুচ্ছ জ্ঞান করা অর্থই নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবা। এবং তা সম্পূর্ণ অহংকারের মধ্যে শামীল। মূলতঃ এটাই অসাম্যের বীজ। যা কিনা অংকুরিত হয়ে ধ্বংসের পথকে প্রশস্ত করে দেয়। রাসূল (সঃ) বলেন, "একটি ধ্বংসকারী জিনিষ হচ্ছে নিজকে বুজুর্গ ও শ্রেষ্ঠতম মনে করা আর এটা হচ্ছে নিকৃষ্টতম অভ্যাস।" তিনি আরও বলেন; "যার দিলে অনু পরিমান অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" বস্তুতঃ মানুষ তার গুণ-ক্ষমতার দরুন কখনই গর্ব করতে পারে না। কেন না; মানুষের গুণ-ক্ষমতার মালিক তো আর মানুষ নয়, আল্লাহ। আল্লাহ মানুষকে গুণ-ক্ষমতা দিয়েছে খলিফা হিসেবে। এবং তা সে খলিফা হিসেবেই ব্যবহার করবে। তাই একজন মানুষ তার যতই গুণ-ক্ষমতা থাকুক না কেন, সে কখনও উহার দরুণ গর্ব করতে পারে না। সুতরাং সে একই আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে অন্যের মতোনই এবং তাকে তার দেয়া উপকরণাদির জবাবদিহি দিতে হবে। বস্তুতঃ এটাই সাম্য এবং সাম্যের আদি বিষয়।

৬। হিংসা ঃ

সাম্যের অন্যতম শত্রু হিংসা। উহা সমাজ জীবনের জন্য একটা চরম ঘৃণ্য ব্যধি। হিংসা বলতে বুঝায়, কোন মানুষের প্রতি আল্লাহর দেয়া নেয়ামত—যেমন, ধন-দৌলত, জ্ঞান-বুদ্ধি, সৌন্দর্য সুষমাকে পছন্দ না করা এবং তার থেকে এই নেয়ামত গুলো ছিনিয়ে নেয়া হোক—মনে প্রাণে এই কামনা করা। হিংসার মধ্যে নিজের জন্যে নেয়ামতের আকাংখার চাইতে অন্যের থেকে ছিনিয়ে নেয়ার আকংখাটাই প্রবল থাকে।

হিংসার মূলে থাকে কখনও বিদ্বেষ ও শত্রুতা, কখনও ব্যক্তিগত অহমিকা ও অপরের সম্পর্কে হীনমান্যতাবোধ, কখনও অন্যকে অনুগত বানানোর প্রেরণা। কখনও কোন সম্মিলিত নিজের ব্যর্থতা ও অপরের সাফল্যতা লাভ; আবার কখনও শুধু মান-সম্মান লাভের আকাংখাই এর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই রাসূল (সঃ) বলেন, "তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক, কারণ আগুন যেমন লাকড়ীকে খেয়ে ফেলে, হিংসাও ঠিক

তেমনি নেকী ও পূণ্যকে খেয়ে ফেলে।" তিনি আরও বলেন, "কারোর দোষ খুঁজে বের করতে যেও না, কারোর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি করো না, পরস্পরে সম্পর্কহীন যে কোন পরস্পরে হিংসা-দ্বেষ ঘোষণা করো না, পরস্পরে শত্রুতা রেখো না, পরস্পরে সম্পর্কহীন থেকো না, পরস্পরে লোভ-লালসা করো না বরং খোদার বান্দা ও ভাই-ভাই হয়ে থাক।"

বস্তুতঃ ইসলাম সামাজিক মানুষের মাঝে এ সমস্ত গুণাবলীর সমাবেশ ঘটানোর মাধ্যমে সত্যিই ভ্রাতৃত্ব সুলভ সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। পুঁজি-বাদ ও সমাজতন্ত্র তা কখনও চায় না; বরং এই সমস্ত গুণাবলীর পরিপন্থী প্রবৃত্তির অবাধ অনুশীলনই হচ্ছে তাদের মূল উপাদান। সমাজতন্ত্রের মৌলিক বিষয় হলো শ্রেণী সংগ্রাম এবং তার উৎপত্তি হিংসার অনুশীলন থেকে। সুতরাং সেখানে কিভাবে সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব, তা বোধগম্যহীন।

তৃতীয় অধ্যায়

সাম্য প্রতিষ্ঠার উপায় ঃ কতিপয় প্রশিক্ষণ

ইসলাম কোন কথা সর্বস্ব বিধান নয় ইসলামের থিওরিটিক্যাল ও প্রাকটিক্যাল বিষয়গুলো সম্বলিত তথা সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোনটিও পরস্পরে বিচ্ছিন্ন নহে।

ইসলামের সাম্য বাস্তবানুগ ও পরিণামদর্শী। ইসলামের এই বাস্তবানুগ ও পরিণামদর্শী সাম্যকে অর্থবহ করার কতকগুলো প্রশিক্ষণ কোর্স আছে, যে কোর্সের মাধ্যমে ইসলামের তত্ত্বগত জ্ঞানকে বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে সাম্য স্থাপনে প্রয়াস পায়।

প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো হলো—(১) নামাজ, (২) রোজা, (৩) হজ্জ, (৪) যাকাত, (৫) দান-ছদকা ও (৬) সুদ রহিতকরণ প্রভৃতি।

১। নামাজ ঃ

সাম্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রশিক্ষণ হলো নামাজ। উহার সময়সূচী রাত দিন ২৪ ঘন্টার ভিতর মাত্র নির্দিষ্ট পাঁচ বার। এই পাঁচ বার প্রতিটা মুসলমানকে মসজিদে একত্রিত হয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম-প্রণালী মোতাবেক উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়।

নামাজ নামক এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে মানুষকে আল্লাহর খাঁটি ইবাদত বা দাসত্ব ও আনুগত্য-উপযোগী সৃষ্টি করা, যার মাধ্যমে মানুষ সব সমান প্রবাদটির বাস্তব অনুশীলন সম্ভব।

মানুষ এবং বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র কেন্দ্রস্থল আল্লাহ। এই বিশ্বের সব কিছুই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এবং পুনরায় আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে এবং এই আসা-যাওয়া কালের মধ্যে অবস্থান ক্ষণটুকুতে মানুষের একটা উদ্দেশ্য নির্ভর অধিকার ও কর্তব্য বিদ্যমান। আর এই উদ্দেশ্য নির্ভর অধিকার ও কর্তব্য একমুখী, ভিন্নমুখী নয়। বস্তুতঃ মানুষের এই একমুখী উদ্দেশ্য নির্ভর অধিকার ও কর্তব্যই সাম্যের একমাত্র মানদণ্ড।

'তুমি কেবলমাত্র আল্লাহরই দাস, তিনি ব্যতীত তুমি আর কারোও দাস নও—না শয়তানের না কোন মানুষের" এই মূলনীতির ভার ইসলামের সাম্য নির্ভর মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত। এই কথারই অনুভূতি সৃষ্টি করে দেয় নামাজ। আর এই জন্যই কোরআর মজিদে নামাজকে যেকের" নামে অভিহিত করা হয়েছে। যিকির অর্থ খোদাকে বার বার স্মরণ। অর্থাৎ কোন মানুষই কোন মানুষের প্রভু, শাসক, আইনদাতা, রিজিক দাতা জীবন মৃত্যুর মালিক নয়, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া—এই কথাই যিকির দ্বারা মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়।

বৈচিত্রময় গুণ-ক্ষমতা, যোগ্যতা, প্রভিতার ফলে কোন সমাজে বা রাষ্ট্রে যার যে স্থান নির্ধারিত হয়েছে, উহা নির্বিশেষে নামাজীগণ যখন একত্রিত হয়ে সকলে একই সারিতে সমানভাবে দাঁড়ান, তখন তাদের মধ্যে কে ছোট কে বড়, কে উচ্চ, কে নিচু, কে রাজা, কে বাদশা, কে আমীর, কে ফকীর, কে ব্যবসায়ী, কে মিসকিন, কে প্রজা, কোন ভেদা-ভেদ থাকে না, প্রত্যেকেই দাস হিসেবে খোদার দরবারে সমানভাবে হাজির হয়।

নামাজে অস্পৃশ্যতার, গর্বের, দাম্ভিকতার, অপবিত্রতার, হিংসার বা বংশ গোত্র, পরিবার, দেশ, ভাষার আদৌ কোন অবকাশ নেই। প্রত্যেকেরই মুখে একই ভাষা—আরবী, প্রত্যেকেরই দৃষ্টি একই দিকে—কেবলা প্রত্যেকের দিল এই দিকে—আল্লাহ, প্রত্যেকেরই কামনা একই দিকে—মুক্তি ও কল্যাণ এবং আল্লাহর রেজা ইত্যাদি সত্যিই এক সাম্যের নির্দশন। পৃথিবীর কোন ব্যবস্থাতে এমনটি নেই। তাই অনেক অমুসলিম নামাজের এই সাম্যমূলক বা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা দেখে মুসলমান হয়েছেন।

নামাজ প্রতি রাত-দিনে পাঁচ বার মানুষকে শিক্ষা দেয় খোদার দাস হিসেবে কি তার অধিকার ও কর্তব্য। কেননা নামাজের মধ্যে পবিত্র কালাম আল-কোরআন পাঠ করতে হয়। আর এই কোরআনই হচ্ছে আল্লাহর দাস হিসেবে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্বলিত বিধান বা নির্দেশনাবলী। আল্লাহর বিধান যে কত সাম্যমূলক তা ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ নামাজই মানুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠামূলক অন্যতম প্রশিক্ষণ।

২। রোজা ঃ

মানুষের আভ্যন্তরীণ রিপুসমূহই সাম্য প্রতিকুল। তাই ইসলাম মানুষের আভ্যন্তরীণ রিপুসমূহকে রোজার অনুশীলন দ্বারা এমনভাবে গীন করে যা কিনা সত্যিই সাম্য অনুকূল।

বছরে ১২ মাসের মধ্যে একটি মাসের আরবী নাম রামাদান। এই মাসে সক্ষম মুসলমানদেরকে দিনের বেলায় যাবতীয় আহার, পান ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকতে হয়। এটা আল্লাহরই নির্দেশ। বাংলায় উক্ত মাসকে রমজান বলে। রোজা মূলতঃ মানুষের গুনাহ ও নফসের খায়েসকে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে আল্লাহর খাটি বান্দা বা দাস বানায়।

রমজান মাসে একজন রোজাদার হালাল জিনিষকে দিনের বেলায় ভোগ করতে পারে না। কেননা এটা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ মানুষের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় গোপন কথা জানেন। তাই আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য মানুষকে রমজান মাসে দিনের বেলায় হালাল জিনিষ হারাম করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারল সে আগামী এগার মাস আল্লাহর অন্যান্য নির্দেশাবলী সুষ্ঠুভাবে পালন করতে সক্ষম হবে। তাই রমজান মাসকে আল্লাহর দাসত্বের মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রশিক্ষণ মাস বলা হয়।

নিদিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে রোজার একই নিয়ম প্রণালী দ্বারা সমগ্র মুসলমানকে একই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দান সত্যিই একটা সাম্য কেন্দ্রিক। রোজার উদ্দেশ্য প্রতিটা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জ্ঞান-বুদ্ধিকে, যোগ্যতা ও প্রতিভাকে কেবল মাত্র আল্লাহরই দাসত্বে পরিণত করা। এর ফলে কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে না, কোন রাজা কোন প্রজাকে বা জাতিকে তার বা অন্যের ইচ্ছানুযায়ী চালাতে পারবে না। এ সবই করতে হবে কেবল মাত্র আল্লাহরই নির্দেশ কোরআনে বর্ণিত বিধান মোতাবেক। মূলতঃ এটাই সাম্য। বলতে কি, যত সব অসাম্য নিজের মর্জিমত চলতে বা চালাতে বা অন্যের ইচ্ছামত চলা বা চালনাতে। অসাম্যের ইতিহাসকে নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করলে এ কথা স্পষ্টতঃই উপলব্ধি করা যায়।

বস্তুতঃ রোজা দ্বারা নফসের বীজ পোড়ানো মানেই অসাম্যের বীজ ধ্বংস করা। কেননা নফসই অসাম্যের কেন্দ্র বিন্দু তথা উৎস শক্তি। সুতরাং রোজার প্রশিক্ষণ মানেই সাম্যের প্রশিক্ষণ।

এ ছাড়া রোজার মাধ্যমে ধনী-গরীব প্রত্যেকেই দিনের বেলায় ক্ষুধার তাড়না উপলব্ধি করতে পারে। ফলে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক একটা সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়ে এক সাম্যের অবতারণা করে।

৩। হজ্জ ঃ

ইসলাম নির্দেশিত সাম্য কোন নিদিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উহার পরিসীমা সমগ্র বিশ্ব মানব সমাজ ব্যাপী। ইসলামের এই প্রোগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করার অন্যতম কার্যকর উপায় হচ্ছে হজ্জ। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এই প্রোগ্রামকে চালু করেছিলেন।

আল্লাহর নির্দেশে নির্ধারিত সময় জিলহজ্জ মাসে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর থেকে স্বচ্ছল মুসলমানগণ একত্রিত হন মক্কা শরীফে। উদ্দেশ্য হজ্জব্রত পালন।

মুসলিম উম্মার স্বচ্ছল তথা নেতৃস্থানীয় মুসলিমগণ আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে প্রেমের উদ্দীপনায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে, আর্থিক কিংবা বিনোদনমূলক ভ্রমণ ব্যতীত এক দীর্ঘ সময় শেষে গোত্র, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল, আকার-আকৃতি নির্বিশেষে একই পোশাক পরিহিত অবস্থায় উন্মুক্ত পায়ে, অলংকার হীন কলেবরে যাবতীয় নফস মুক্ত হৃদয়ে এহরাম বেঁধে একইভাবে উচ্চ স্বরে 'আমি হাজির' 'আমি হাজির' বলে আল্লাহর মানুষ-অদৃশ্য দৃষ্টির সামনে উপস্থিত হতে হয়। সত্যিই এ এক অভূতপূর্ব সাম্যের নির্দশন। উহা অবলোকন ভিন্ন উপলব্ধি সম্ভব নয়।

হজ্জের "আমি হাজির" 'আমি হাজির' বা আল্লাহ তোমার গোলাম হাজির, তোমার গোলাম হাজির ধ্বনির মাধ্যমে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) এর কাল থেকে প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনের হাজীদের এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে থাকে, যা কিনা দীর্ঘ বছরের দূরত্বকে মাঝখান থেকে সরিয়ে প্রত্যেকেই একাকার হয়ে যায়। ইব্রাহিম

(আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) আল্লাহ-দাসত্বের অগ্নি পরীক্ষায় যেভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন পরবর্তীতে যারা হজ্জব্রত পালনে যান তাদের ঐ একাকার সম্পর্ক দ্বারা অনুরূপ পরীক্ষা উত্তীর্ণের প্রতিজ্ঞার কথাই প্রমাণিত হয়, এবং ঘোষিত হয় নিজের নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের এবং উহার নমুনা স্বরূপ হাজীদের চাঁদমারী করতে হয়—দুটি পাথর মেরে। চাঁদমারীর এ দুটি পাথর আল্লাহ আনুগত্যের বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে। যাবতীয় অসাম্যের বিরুদ্ধে।

বস্তুতঃ হজ্জের প্রশিক্ষণ দ্বারা বিশ্ব মুসলিম ভাই ভাই; কেউ কারোর শত্রু নয়, এক দেশের ভাই-এর দুঃখে অপর দেশের ভাই দুঃখী হবে, এক দেশের সুখে, অপর দেশ সুখী হবে প্রভৃতি শিক্ষা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া সব থেকে বড় শিক্ষা হ'ল পৃথিবীর সব মুসলমান একই আল্লাহর দাস এবং প্রত্যেকের জীবনের ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড একমাত্র ইসলাম। এর থেকে বড় সাম্য আর কিসে হতে পারে? হজ্জে এই শিক্ষা দ্বারা বিশ্ব মুসলিম তাদের ধন মাল জ্ঞান-প্রতিভা প্রভৃতি সমভাবে বন্টন করে সমগ্র বিশ্ব মাঝে এক অভূতপূর্ব সাম্য স্থাপনে প্রয়াস পাবে। কার্যতঃ হজ্জের প্রশিক্ষণ মানেই বিশ্বের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রশিক্ষণ।

৪। যাকাত ঃ

নামাজ, রোজা, হজ্জ দ্বারা মুসলমানদের সাম্য কেন্দ্রিক দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি করা হয়। আর যাকাত দ্বারা মুসলমানদের সাম্যের জাগতিক অনুশীলনভ্যাস সৃষ্টি করা হয়। যাকাত অর্থ-সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সাম্য স্থাপনে সক্ষম। ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্বের অংশ স্বরূপ যাকাত। যাকাত শব্দের অর্থ হলো শোধন এবং উহার পরিব্যাপ্তি মানুষের জীবনের নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তর পর্যন্ত।

নৈতিকতার ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিকে তিরোহিত করা। যাদ্বারা অতৃপ্ত আত্মা তৃপ্তি পেতে পারে। পুঁজিবাদে প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয়ের মানসিকতার ব্যক্তিকে শোধনের কোন পথ না থাকায় মানুষ চরম স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়, যার ফলে একশ্রেণী সর্বহারা অপর শ্রেণী ধন্য-ধনে পরিণত হয়ে এক চরম

অসাম্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু ইসলাম প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদের উপর শতকরা আড়াই টাকা যাকাত বাধ্যতামূলক করে মানুষের পুঁজিকেন্দ্রিক রোগ-কল্যাণ কেন্দ্রিক বা মুক্ত করে তোলে। যার ফলে সমাজের কেউ তার অর্থনৈতিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে না।

অতঃপর যাকাত সমাজের মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদার মাঝে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা আনায়নে তৎপরতা চালায়। সমাজের মানুষের বৈচিত্রময় আয়ের মাঝে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠায় যাকাত সত্যিই এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট হারে আদায়কৃত সম্পদ যাদের প্রয়োজন তাদের মধ্যে বিতরণ করাই হলো যাকাতের আসল উদ্দেশ্য। সমাজে এমনও দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তির সম্পদের প্রয়োজন নেই, উপরন্তু সে তখনও সম্পদ লাভের আশায় পাগলপ্রায় থাকে। যাকাত মানুষের এই শয়তানী প্রেরণা থেকে পবিত্র করে। কেননা সম্পদের বা পুঁজির উদ্দেশ্য পুঁজি নয় কল্যাণ।

এতদ্ব্যতীত যাকাতের শোধণমূলক কর্মসূচী সত্যিই সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। কোন সমাজে একজন সম্পদের পাহাড় রচনা করবে অপরদিকে অন্যজন সম্পদের অভাবে না খেয়ে, না দেয়ে হা-হা-কার করে উঠবে, ইসলাম তা আদৌ পছন্দ করে না। তাই যাকাত তার শোধনমূলক ভূমিকা দ্বারা সমাজের মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়।

বস্তুতঃ যাকাত আদায় ও বন্টন ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে উত্তরোত্তর যাকাত গ্রহীতার সংখ্যা হ্রাস পেয়ে প্রদানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পৃথিবীর বুকে অবস্থিত খুব কম মুসলিম দেশে এরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং এ জন্যেই পৃথিবীর মানুষ বর্তমানে যাকাতের স্বরূপ এবং উহার ভূমিকা সম্পর্কে অনবহিত।

বস্তুতঃ যাকাত প্রদান প্রশিক্ষণ দ্বারা মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

৫। সাদ্‌কা, দান, ফিতরা ও উশর ঃ

অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় ইসলাম অত্যন্ত যত্নবান। তাই বলে

জোর করে ছিনিয়ে বা হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমলব্ধ অর্থকে অবৈধ বা চুরির মাল বলে ছিনিয়ে নিয়ে নয়, বরং সম্পদের অধিক মালিকানা সংক্রান্ত ধারণা প্রবৃদ্ধ করানোর পর সদকা, দান, ফিতরা ও উশরের মাধ্যমে প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদশালীদের নিকট থেকে আদায় করে থাকে এবং তা যাদের প্রয়োজন তাদের মাঝে সত্যিকার ইনসাফের সাথে বিতরণ করে দেয়। নিঃসন্দেহে ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান সত্যিই এক অভূতপূর্ব সাম্য কেন্দ্রিক। ইসলামের বিধান মোতাবেক মুসলিমগণ স্বেচ্ছায় তাদের অতিরিক্ত সম্পদ দান বা সদকা হিসেবে অভাবীদের হাতে তুলে দিয়ে এত বেশী তৃপ্তি পায়, তা বলা মুসকিল। কেননা এরূপ দান, সদকা, ফিতরা ও উশর স্বেচ্ছায় প্রদানের পিছনে একটা বিরাট বিনিময় বিদ্যমান এবং তাই হবে সত্যিকার কল্যাণের ও মুক্তির মাধ্যম। সুতরাং ইসলামী সমাজে মানুষ অধিক কল্যাণ কামনার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করবে অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের যা দান করে সে এক মহা সম্পদশালী হিসেবে আদালতে-আখেরাতে সৃষ্টিকর্তা রবের সম্মুখে হাজির হতে পারে। রাসূল (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরামগণ তার বাস্তব নির্দশন। অনেক সাহাবাকে দেখা গেছে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সঃ) কে সম্বল রেখে তাদের জীবনের সবকিছু দান করে দিয়েছেন। সুতরাং এরূপ সমাজকে সাম্যের সমাজ বলা যাবে না তো পুঁজিবাদী স্বার্থপরতা কেন্দ্রিক অথবা সমাজতন্ত্রের জুলুমমূলক বন্টন-নীতির সমাজকে সাম্যের সমাজ বলা হবে? বস্তুতঃ দান, সদকা, ফিতরা ও উশর প্রদানের প্রশিক্ষণ মানেই সাম্যের প্রশিক্ষণ।

৬। সুদ ঃ

সুদ সাম্য পরিপন্থি এক অকল্যাণমূলক ব্যবস্থা। পুঁজি পুঁজি-কেন্দ্রিক; কল্যাণ কেন্দ্রিক নয়, তার বাস্তব অবলম্বন হলো এই সুদ। এই সুদ দ্বারা ধনীকে ধনী ও গরীবকে গরীব করে দেয়া হয়। তাই ইসলাম সুদকে চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে। সুদখোর, সুদ গ্রহণকারী ও সুদের কাগজ লেখক তৎসহ উহার সাক্ষী প্রত্যেকেই দোজখে যাবে। তাই ইসলাম সুদের পরিবর্তে লাভ-লোকসান কেন্দ্রিক পুঁজি বিনিয়োগকে অনুমতি দিয়েছে। কেননা মুসলমান দুঃখে ও সুখে একে অপরের ভাই-ভাই। পুঁজিবাদী সমাজকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সে সমাজে সুদের প্রতিক্রিয়ায়

কত শত স্বচ্ছল পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। অপরদিকে যদিও সমাজতন্ত্র সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে থাকে, তবুও তারাও আজকাল সুদকে রাষ্ট্রীয় মালিকানার লেন-দেনের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দিচ্ছে। একমাত্র ইসলাম ছাড়া আর বিধানে সুদের স্বীকৃতি বিদ্যমান। সুতরাং ইসলাম ছাড়া সাম্য আর কোথায়ও আছে বা থাকতে পারে না। বস্তুতঃ সুদ না খাওয়া প্রশিক্ষণ সত্যিই সাম্যের প্রশিক্ষণ।

চতুর্থ অধ্যায়

পুঁজিবাদে সাম্য

ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও স্বার্থপরতার অবাধনীতিই হচ্ছে পুঁজিবাদের প্রাণ-বস্তু। ব্যক্তি ও সমষ্টির গুরুত্ব মানবতার সুষ্ঠু বিকাশে অপরিহার্য। অথচ পুঁজিবাদ সমষ্টির কোন গুরুত্ব উপলব্ধি করতে নারাজ। যার ফলে ব্যক্তি তার গুণ-ক্ষমতা দ্বারা উৎপাদিত সম্পদের ভোগ-বন্টনে অবাধ তথা বাধা-বন্ধনহীন। তাই পুঁজিবাদে ব্যক্তি তার ভাগ্য রচনায় বৈধ-অবৈধ এর ধরা-ছোয়ার উর্ধে। ছলে, বলে, কলে, কৌশলে—যে কোন ভাবেই হোক নিজ ভাগ্য রচনা করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য পুঁজিবাদী সমাজে থাকে না। যার ফলে সমাজের অতিরিক্ত যোগ্যতাবানরা হয় প্রতিষ্ঠিত আর কম যোগ্যতার অধিকারী মানুষগুলো হয় ধিক্কৃত। যোগ্যতার সুযোগে যোগ্যতমরা যোগ্যতাহীনদেরকে বশীভূত করে তাদেরকে দাসানুদাসে পরিণত করে ছাড়ে, যা কিনা মানব প্রকৃতি তথা সাম্য বিরুদ্ধ।

পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের প্রকৃতিগত গুণ-ক্ষমতার পার্থক্যই সাম্যের গতি নির্ধারক। যে মানুষ তার নিজস্ব যোগ্যতা বলে অধিক উৎপাদনে সক্ষম, তার মালিক সে ছাড়া আর কে হতে পারে? এতে অন্যের আবার কিসের অধিকার? এবং উৎপাদনকারীর প্রতি কি-ই বা কর্তব্য থাকতে পারে? আর এই ধরণের মনোভাব মানুষকে উদ্দেশ্যহীন চলন্ত এক প্রাণীতে পরিণত করে। বর্তমানের এই সংক্ষিপ্ত জীবনটুকু দ্বারা আর তার কোন ভবিষ্যৎ নেই। এই ধারণার বশীভূতী স্বরূপ মানুষ এত বেশী স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে যে, সে এই ধরাকে সরা জ্ঞান করে পৃথিবীতে নিজেরাই সব কিছুর প্রভু সেজে অন্যদেরকে সেবাদাসে পরিণত করে এক চরম অসাম্য সৃষ্টিতে প্রয়াস পায়।

পুঁজিবাদী সমাজে অধিক উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ উপার্জনে দিশেহারা হয়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উক্ত উৎপাদন দ্বারা ব্যক্তি বা সমাজের কোন ক্ষতি হবে কি হবে না তার তোয়াক্কা সে করেনা ঠিকই। কিন্তু এর থেকে মারাত্মক

পদক্ষেপ গ্রহন করে উৎপাদিত সম্পদ বন্টনের বেলায়। পুঁজিবাদের বন্টন প্রকৃতি এত অমানবিক তথা অসাম্য নির্ভর যা কিনা ভাষায় প্রকাশ করা দুরহ ব্যাপার।

যে যা উৎপাদন করবে, সে তাই ভোগ দখল করবে। একের উৎপাদনে অন্যের তিল পরিমান অধিকার নেই। ফলে যে উৎপাদন ক্ষম সেই বেঁচে থাকবে। আর যে উহাতে অক্ষম সে বেচে থাকবে না। সহজ ভাবে বলতে গেলে এটাকেই ডারউইনের মতবাদ বলা চলে।

প্রথম অধ্যায় প্রদত্ত উদাহরনটি এখানে পুনরায় পেশ করে তাদ্বারা সহজ বিষয়টি বুঝাতে চাচ্ছি।

একটি পুঁজিবাদী সমাজে ক, খ ও গ নামে তিনজন ব্যক্তি বাস করে। তাদের যোগ্যতা অনুসারে তারা যথাক্রমে ১০০০, ৩০০ ও ২০০ টাকা উপার্জন করতে পারে। কিন্তু তাদের প্রয়োজন ৭০০ ৬০০ ও ৫০০ টাকা। তাহলে 'ক' তার প্রয়োজনাতিরিক্ত (১০০০—৭০০) ৩০০ টাকা উৎপাদনে সক্ষম। খ তার প্রয়োজনানুগ উৎপাদনে সমান সমান। তবে 'গ' তার প্রয়োজনের তুলনায় ৫০০-২০০=৩০০ টাকা কম উৎপাদনে সমর্থ।

পুঁজিবাদী সমাজে যেহেতু ব্যক্তি তার উৎপাদিত সম্পদের নিরংকুশ মালিক অন্যের কোন প্রকার অধিকার তাতে থাকে না। যার ফলে 'ক' তার প্রয়োজনাতিরিক্ত অধিক পুঁজি উপার্জনে বিনিয়োগ করবে এবং প্রতিনিয়ত তার পুঁজি বৃদ্ধি পেয়েই চলবে। পক্ষান্তরে 'গ' তার প্রয়োজনীয় সম্পদ উৎপাদন করতে না পারায় তাকে প্রকৃতির সাথে চরম লড়াই করে না খেয়ে না দেয়ে কংকাল সার দেহে তার হায়াত শেষে এই স্বার্থপর পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। সুতরাং পুঁজিবাদী সমাজে স্বার্থপরতার নীতি অনুসৃত হওয়ায় 'গ' শ্রেণীর মানুষের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

এখন প্রশ্ন ঃ এটা কি সাম্য? সমাজে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কি কোন ঘাটতি ছিল? যদি না থেকে থাকে তাহলে 'গ' শ্রেণীরা এভাবে মরল কেন? তাদের কিকোন অধিকার নেই একটু স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপনে? অধিকার যদি না থাকে তবে কেন প্রকৃতি তাদের এত কষ্ট-দুঃখের জন্য

এই জন্যেই মূলতঃ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে উৎপাদনের গতিধারা নিতান্তই কম থাকে। পৃথিবীর একটা বিরাট এলাকা জুড়ে সোভিয়েট রাশিয়া ও গণচীন। ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লবের পর যার সাম্রাজ্যের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে, রাশিয়াতে যে সম্পদ মৌজুত আছে, তা আগামী ২০ হাজার বছরের জন্য পর্যাপ্ত।

কিন্তু মালিকানার অভাবে সৃষ্টির প্রেরণা রহিত হয়ে যাবার ফলে রাশিয়া ও চীনকে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের জন্যে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে। সব থেকে মজার ব্যাপার হল, যাদের সাথে সমাজতন্ত্রের আজীবন সংগ্রাম তাদেরই নিকট ধর্ণা দিতে হচ্ছে খাদ্য শষ্যের জন্য। এ বছর (১৯৮৫) রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সব থেকে বিপুল পরিমান খাদ্যশষ্য আমদানী করল। অথচ রাশিয়া এবং চীনের বিরাট এলাকা আজও অনাবাদী রয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তি মালিকানার অভাবে বৈচিত্রময় প্রতিভার স্বাধীন অনুশীলন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হওয়ায় এ সমস্ত দেশের অধিবাসীদের সৃজনশীল প্রতিভা দিন দিন ভোঁথা হচ্ছে এক বিকাশ ধর্মীহীন সাম্যে পরিণত হতে যাচ্ছে। যার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয় দক্ষতা তাদের কিনা আজ আর নেই। রাশিয়া সাইবেরীয়ার উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর জন্য তার চিরশত্রু আমেরিকা ও জাপানের মুখাপেক্ষী। জাপান ও জার্মান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল। অথচ চীন ও রাশিয়া ছিল বিজয়ী শক্তি। যুদ্ধে বিজয় লাভ সত্ত্বেও সে সমস্ত দেশের জনগণের ভাগ্যে তেমন কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি, বরং যতই দিন যাচ্ছে, ততই তারা আরও বেশী দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়ছে।

[দুই] সমাজতন্ত্র মানুষের সাম্য পরিপন্থী প্রবৃত্তির উপর একান্তভাবেই প্রতিষ্ঠিত। মানব জীবনকে সূক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তার মধ্যে অনেকগুলো গুণ-ক্ষমতা বিদ্যমান। মনন-ক্ষমতা, আবেগ, ইচ্ছা শক্তি, সহজাত প্রবৃত্তি, অহংবোধ, পরার্থিতা অন্যতম। সমাজতন্ত্র এই সমস্ত প্রবৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্যশীলন অনুশীলন নীতি প্রবর্তন না করে বরং উহার একটিকে অবলম্বন করে তার ভীত রচনা করেছে, যা কিনা বাস্তবতঃ সাম্য পরিপন্থী ছাড়া আর কিছুই নয়। অহংবোধ বা বিদ্বেষই হ'ল সমাজতন্ত্রের মূলভিত্তি,

ক, খ ও গ প্রকৃতিগত বৈচিত্রতাপূর্ণ ক্ষমতা দ্বারা উপার্জন করতে পারে যথাক্রমে ৮০০, ৪০০ ও ১০০ টাকা। অথচ তাদের প্রয়োজন পর্যায়ক্রমে ৫০০, ৪০০ ও ৩০০ টাকা। এখানে 'ক' তার যোগ্যতা বলে অতিরিক্ত (৮০০-৫০০) ৩০০ টাকা উপার্জন করতে সক্ষম, যা কিনা উক্ত সমাজের সামষ্টিক প্রয়োজনে ('গ' এর অতিরিক্ত প্রয়োজন ৩০০-১০০=২০০ টাকা) অপরিহার্য। এখানেই বৈচিত্রতাপূর্ণ গুণ-ক্ষমতার দ্বারা অর্জিত সম্পদ সামষ্টিক প্রয়োজনে কি প্রয়োজন তা উপলব্ধি করা যায়। সাম্য এখানেই অর্থাৎ 'ক' এর অতিরিক্ত 'গ' এর প্রয়োজনে বন্টন প্রকৃতিতে।

পুঁজিবাদে 'ক' এর অতিরিক্ত উপার্জনকে তার নিজস্ব সম্পদ বলে ঘোষণা করে উহার ব্যবহারে তাকে যথেচ্ছা অধিকার প্রদান করে থাকে। ফলে, 'গ' তার প্রয়োজনানুগ সম্পদ প্রাপ্তির অধিকার থেকে হয় বঞ্চিত। অপর দিকে সমাজতন্ত্র 'ক' এর ঐ অতিরিক্ত উপার্জনকে চুরির মাল বলে তার কাছ থেকে তা জোর করে ছিনিয়ে নিতে তৎপর।

যেহেতু 'ক' তার অতিরিক্তের মালিক নয়, তাই তার উক্ত অতিরিক্তে কোনই অধিকার নেই।

আগেই বলেছি যেখানে ব্যক্তি মালিকানা নেই, সেখানে গুণ ক্ষমতার কোন আন্তরিকতাপূর্ণ প্রয়োগ নেই। আর যেখানে গুণ-ক্ষমতার কোন আন্তরিকতাপূর্ণ প্রয়োগ নেই, সেখানে প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদনের কোন প্রশ্নই উঠে না।

যেহেতু সমাজতন্ত্রে অতিরিক্ত উৎপাদনের কোনই প্রশ্ন উঠে না, তা'হলে এখন চিন্তা করুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামষ্টিক প্রয়োজন কিভাবে পূরণ সম্ভব? 'ক' এর অতিরিক্ত উৎপাদন চুরির মালের সহিত তুলনা করে তা কেড়ে নেয়া হচ্ছে। তাহ'ল নিশ্চয় সে পরবর্তীতে তার প্রয়োজন ৫০০ টাকার অধিক আর কোন উৎপাদন করবে না। যেহেতু সে তার অতিরিক্ত উৎপাদন করবে না, সেহেতু সমাজকে তার সামষ্টিক প্রয়োজন মিটাতে অন্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না। এখানে একটি কথা স্মরণযোগ্য, মানুষের ইচ্ছা বিরোধী চাপের দ্বারা কিছু আদায় করা সম্ভবানা—সে যত ভয়াবহ তুল্য হোক না কেন।

মালিকানার উপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। কেননা ব্যক্তি মালিকানা সমাজের মানুষের মাঝে সৃষ্টির প্রেরণা যোগায়ে সম্পদের সমৃদ্ধি ঘটায়, যাদ্বারা সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান সামষ্টিক চাহিদা পূরণ সম্ভব।

অথচ সমাজতন্ত্র এই বাস্তব সত্য কথাটা একেবারেই অস্বীকার করে। সমাজতন্ত্র মানুষের বৈচিত্রময় গুণ-ক্ষমতার স্বাধীন অনুশীলন দ্বারা সৃষ্ট সম্পদের ব্যক্তি মালিকানার অস্থিত্বই স্বীকার করে না।

সেই সমাজের সামগ্রিক চাহিদা পূরণের জন্য সমস্ত উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়াকে কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গোটা সমাজের বৈচিত্রময় গুণ-ক্ষমতাকে উহার দাসানুদাস বানিয়ে ছাড়ে, ফলে মানুষ তাদের সৃষ্টির প্রেরণা হারিয়ে ফেলে। মূলতঃ এরই জন্যে সমাজের সমষ্টিক চাহিদা পূরণে এক চরম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

সমাজতান্ত্রিক দর্শনে, মানুষ যে সৃষ্টির সেরা, তার কোন স্বীকৃতি নেই। এখানে মানুষ এবং মানবেতর প্রাণীর মাঝে কোনই তফাৎ নেই। মানুষ যে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে এবং তার পিছনে প্রেরণা প্রয়োজন তারা তা স্বীকার করতে নারাজ। তাদের ধারণা সমস্ত সম্পদ পূর্ব হতেই সৃষ্টি হয়ে আছে, তাই মানুষ কোন সম্পদ সৃষ্টি করতে অক্ষম। মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মত সৃষ্টি ধর্মী প্রেরণা থেকে বঞ্চিত। তার সম্পদ বৃদ্ধির যোগ্যতা নেই। কিন্তু সম্পদশালীরা যে সম্পদ জড়ো করে তা মেধা খাটিয়ে সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নয়, বরং লুটপাটের মাধ্যমে। তাদের অভিমত সৃষ্টি বা সঞ্চয়ের মাধ্যমে সম্পদের মালিকানা অর্জন করা যায় না। সম্পদের মালিক হওয়া যায় কেবলমাত্র চুরির মাধ্যমে। সঞ্চয় মাত্রেই চুরি—তাই সমাজতন্ত্রের দর্শন হলো প্রত্যেককে সাধ্যমত শ্রমের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় ভরণ পোষণ পাবে। চুরি করে যা অর্জিত হয়েছে তা বলপূর্বক কেড়ে নেয়া আদৌ নিন্দনীয় নয়, বরং অবৈধ কাজের দ্বারা কেউ যাতে সমৃদ্ধি লাভ করতে না পারে, তা প্রতিরোধ করা আবশ্যক।

বিষয়টি সহজবোধ করার জন্য পূর্বের উদাহরণটিকে এখানে উল্লেখ করা হ'ল।

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজতন্ত্রে সাম্য ঃ

সাম্য নাকি কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রেই আছে—এ কথা স্কুল জীবন থেকে শুনে আসছিলাম। তাই সাম্যের একজন নগণ্য পূজারী হিসেবে সমাজতন্ত্রকে সাম্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র অবলম্বন মনে করতাম। কিন্তু যখন থেকে জানতে পেরেছিলাম যে, সত্যিকার সাম্য অর্থে সমাজতন্ত্র সাম্য নুকুল নয়, বরং চরম প্রতিকুল ; তখন থেকেই পূর্ব ধারণা পরিত্যাগ করেছি।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র মূলতঃ একই বীজ থেকে উৎফলিত দু'টি বৃক্ষ মাত্র। পার্থক্য শুধুমাত্র পদ্ধতিতেই, উদ্দেশ্যে নয়। পুঁজিবাদে পুঁজি থাকে অনিয়ন্ত্রিত পুঁজি কেন্দ্রিক, পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রে পুঁজি থাকে নিয়ন্ত্রিত পুঁজি কেন্দ্রিক। উভয় ব্যবস্থাতেই পুঁজি পুঁজি কেন্দ্রিক, তাহলে পার্থক্যটা কোথায় ? আর যে সমস্ত ব্যবস্থাতে পুঁজি থাকে পুঁজি কেন্দ্রিক বা বস্তুকেন্দ্রিক, সে সমস্ত ব্যবস্থা দ্বারা কখনই মানব কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। অথচ কল্যাণ ছাড়া সাম্য অর্থহীন। সুতরাং সমাজতন্ত্রে কোন সাম্য নেই, অসাম্য ছাড়া।

সাম্যবাদী ব্যবস্থাতে সাম্য নেই, কথাটা কেমন মনে হয়। কিন্তু তা যে কত বাস্তব, তা নিম্ন আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায়।

[এক] সমাজতন্ত্র প্রকৃতি বিরোধী এক চরম অমানবিক ব্যবস্থা। যা কিনা মানুষের মাঝে বিদ্যমান বৈচিত্রময় গুণ-ক্ষমতার অনুশীলন ধারাকে জোর করে প্রকৃতি বিরোধী উপায়ে কৃত্রিম সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায় এবং উহা মানব স্বভাবের স্বাভাবিক বিকাশ ধারাকে স্তম্ভিত করে দেয়। যার ফলে সেই সমাজের মানুষগুলোর আর কোন মানবিক অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকে না। সমগ্র মানুষ তখন এক যান্ত্রিক বৈশিষ্টমণ্ডিত সাম্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

মানব সমাজের সামষ্টিক প্রয়োজন বৈচিত্রময় ব্যষ্টিক কর্ম প্রচেষ্টার যোগফল দ্বারা পূরণ সম্ভব। আর এই বৈচিত্রময় ব্যষ্টিক কর্ম প্রচেষ্টা কার্যতঃ ব্যক্তির স্ব-স্ব গুণ-ক্ষমতার স্বাধীন অনুশীলন দ্বারা সৃষ্ট ব্যক্তি

ঘুষ, চোকলখুরী, ছিনতাই, হাউজী, আত্মসাধ, অবৈধ দখল, অবৈধ অংশ গ্রহণ, জালিয়াতি, হত্যা প্রভৃতি উল্লেখ্য।

বস্তুতঃ এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হলো যে, পুঁজিবাদে সাম্যের অপরিহার্য উপাদানসমূহের ন্যূনতমও বিদ্যমান নেই। যার জন্যে পুঁজিবাদ অসাম্যের বাদে রূপান্তরিত হয়েছে। কেননা মানুষের মৌল অধিকারসমূহ স্ব স্ব যোগ্যতা নির্ভর, সেটা কিনা মূলতঃই অসাম্যের অবতার। অনুরূপ পারস্পরিক কল্যাণ কামনার কোনই উপসর্গ নেই পুঁজিবাদে, থাকলে 'ক' অবশ্যই 'গ' এর কল্যাণ কামনায় তার অতিরিক্ত সবটুকুই বিলিয়ে দিত। আত্মত্যাগের তো প্রশ্নই উঠে না। আর মানদণ্ড ব্যক্তি ও স্বার্থ ভেদে ভিন্ন প্রকৃতির। পুঁজিবাদের সাম্যের মানদণ্ড যোগ্যতমরাই টিকে থাকবে। বস্তুতঃ এর দ্বারা কখনও বৈচিত্রতাপূর্ণ স্বভাবের ক্ষেত্রে মানব সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব নয়।

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে আমি অন্ততঃ সমাজ ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করি না। এটা পরিষ্কার লুটপাটের মুল্লক ছাড়া আর কিছুই না। লুটপাটের মুল্লকে 'জোর যার মুল্লক তার' নীতির চূড়ান্ত অনুশীলন প্রক্রিয়া নিরন্তর চলতে থাকে। যার ফলে কেউ লুট করে, কেউ লুটের শিকার হয় এবং এর পরিণতি চরম অসাম্য ছাড়া আর কি হতে পারে?

প্রবৃত্তির অবাধ অনুশীলন ক্ষেত্র হলো পুঁজিবাদ। বিবেক বলে কিছু অবশিষ্ট থাকতে পারে না পুঁজিবাদে। তাই পুঁজিবাদে যার বিবেক থাকে সে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশ এহেন পুঁজিবাদকে তাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে সে সমস্ত রাষ্ট্রে যা হবার তা-ই হচ্ছে। আজ অর্ধ পৃথিবী এরই শিকার। সেখানকার দুঃখ মানবতা আজ সাম্য চাই এবং বাঁচার মত বাঁচতে চাই। আছে কি কেউ তাদেরকে সাম্যের পরিবেশ দিতে পারে? এরই অপেক্ষায় সেখানকার মানুষগুলো ভবিষ্যতের পানে চেয়ে আছে।

অনুশীলনে অবাধ, বাধা বন্ধনহীন। ফলে স্বার্থপরতার দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়ত চলতেই থাকে। সে দ্বন্দ্ব 'মাইট-ইজ-রাইট' নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে দুর্বলেরা তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। যার ফলে সেখানে সাম্য বলতে কোন জিনিষ থাকতে পারে না। কিন্তু মানব প্রকৃতি কি এটাকে স্বীকার করতে পারে? নিশ্চয় না। কেননা মানব প্রকৃতিতে স্বার্থপরতার পাশেই পরার্থিতার সূত্র গাথা। সুতরাং মানব জীবনকে অর্থবহ করতে হলে উভয়ই প্রবৃত্তি দু'টির সহ অবস্থান একান্ত অপরিহার্য বটে। এই উভয়ই গুনাবলী সহ অবস্থানের শর্ত সাপেক্ষ সাম্য। যেহেতু পুঁজিবাদে তা থাকে না, সেহেতু পুঁজিবাদে কোন সাম্য নেই, থাকতে পারে না।

পুঁজিবাদের নিকট প্রশ্ন ঃ কেন পুঁজির প্রয়োজন? পুঁজির জন্য পুঁজি না মানব কল্যাণের জন্য? পুঁজিবাদ এর জবাবে বলে পুঁজির জন্য পুঁজি, মানব কল্যাণের জন্য নয়। অথচ সাম্যের অন্যতম উপাদান কল্যাণ কামনা। কেননা পুঁজি কখনই মানুষ ছাড়া তার অস্তিত্বে বহাল থাকতে পারে না। সমুদ্রের বুকে লুকায়িত মণি-মাণিকের কি-ই বা মূল্য, যতক্ষন পর্যন্ত না উহা উত্তোলনের পর মানব কল্যাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। সুতরাং পুঁজিবাদ অসাম্যমূলক এক অমানবিক মতবাদ।

পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পুঁজির কোন প্রান্তিকতা নেই। আর মানুষ যখনই উহার শিকারে পরিণত হয়, তখনই মানুষের মনে প্রান্তিকতাহীন পুঁজি এক দৃঢ় বাসা বেধে বসে। মানুষ তখন হায়নার মত উহার পিছনে ঘুরে ঘুরে উহার রোগে রোগাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। যার ঔষধ মানব সমাজ ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস তার সাক্ষী। কথায় আছে —যার যত আছে, সে-ই তত চায়। এ দ্বারা অসাম্য ছাড়া আর কিসের প্রকাশ ঘটে তা আমার জানা নেই। সুতরাং এদ্বারা সাম্যের অন্যতম উপাদান—আত্মত্যাগ, এর ন্যূনতম নিদর্শন মিলে না।

পুঁজিবাদে মানব সাম্য বিধ্বংসকারী যত সব উপকরণ থাকা দরকার তা সবই তথায় মৌজুত। উহা মানবতার সাম্যকে কুরে কুরে খেয়ে গোটা মানব সমাজকে শূন্য করে ফেলে, চুরি, ডাকাতি, লুট-পাট, রাহাজানী, সুদ,

[দুই] Grapce of Wrath এর লেখক দেখিয়েছেন যে, আমেরিকার বেকার শ্রমিকরা কালিফোনিয়ার ফলের বাগানে কাজ করতে যায়। যেহেতু শ্রমিকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হয়ে পড়ে. তাই মুজুরীর হার কেবলমাত্র জীবন ধারণের পর্যায়ে নেমে আসে। কিন্তু কিছু সংখ্যক নতুন শ্রমিকের মধ্যেও অনেক বেকার থেকে যায়। এই সমস্ত লোক গুলো অভুজ বা অর্ধভুজ থেকে মৃত্যুর সহজ শিকারে পরিণত হয়। অথচ তখনও বাগানে ফলের উৎপাদন প্রচুর ছিল। মালিকদের হিসাব অনুসারে উৎপাদনের বিরাট একটা অংশ নষ্ট করার প্রয়োজন দেখা দেয়। চেরী ও পটবেরী গাছে গাছে প্রচুর পরিমানে পচতে থাকে, যা কিনা হাজার হাজার লোক তাদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্যই মজুরীর বিনিময়ে সেগুলো আহরণ করতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু মালিকরা তাদের প্রবৃত্তির পশুত্ব সুলভ আচরণের জন্য তাতে রাজী হতে পারল না।

একবার কালিফোনিয়াতে প্রচুর কমলালেবু উৎপাদিত হওয়ায় উহার বাজার দর কমে যায়। ফলে মালিকরা হাজার হাজার কমলা সোনার পাহাড়ের মত সাজিয়ে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেয়। অথচ এটা এমনই এক সময়ে করা হচ্ছিল, যখন তথায় হাজার হাজার শিশু পুষ্টিহীনতায় ধুকে ধুকে মৃত্যুর শিকারে পরিণত হচ্ছিল।

এখন ভাববার বিষয় হল ঃ এই যে বিপুল পরিমাণ উৎপাদিত পণ্য ধ্বংস করা হলো এর মালিক কারা? যারা ধ্বংস করল তারা? না যারা উহার অভাবে ধুকে ধুকে মরল, তারা? ধ্বংস করাই যদি প্রয়োজন হয়, তবে কেন প্রকৃতি উহা অহেতুক প্রদান করল? প্রকৃতি কি এতই খাম খেয়ালীর? নিশ্চয় না। প্রকৃতির একটা নিজস্ব নিয়ম-নীতি থাকে। প্রকৃতি তার বিধান মোতাবেক প্রয়োজনানুগ সম্পদই প্রদান করে থাকে। মানুষ উহা ভোগ বন্টনে গিয়ে নিজেদের উপর জুলুম করে বলেই এরূপ অবস্থার সূত্রপাত ঘটে। সুতরাং এর জন্যে প্রকৃতি একটুও দায়ী নয়।

মানুষ একাধিক পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তির অধিকারী। মানুষের এহেন স্বরূপ নিয়ে সমাজ জীবনে বসবাস করতে গেলে উভয়ের মাঝে একটা ভারসাম্য স্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যা ছাড়া একদণ্ডও মনুষ্য সমাজ টিকে থাকতে পারে না। অথচ পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ তার প্রবৃত্তির

এখানে সৃষ্টি করল ? 'ক' কি তার অতিরিক্ত উৎপাদনের একচ্ছত্র মালিক ? তার ঐ অতিরিক্ত 'গ' শ্রেণীর উপর জুলুম করার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ?

এ সমস্ত প্রশ্নের সাম্যানুকূল জবাব হল সমাজের মানুষ তাদের বৈচিত্রময় গুণ-ক্ষমতা বলে উৎপাদনে তৎপর হবে এবং বন্টনের বেলায় তারা সমাজের সামষ্টিক প্রয়োজন অনুসারে তা ভোগ করবে। আগেই বলেছি, সাম্য উৎপাদনে নয়, বন্টনে। এই কাজকে সহজ সাধ্য করার জন্য প্রকৃতি মানুষের মাঝে একদিকে স্বার্থপরতার স্বভাব এবং তার পাশে পাশে পরার্থীতার অনুপ্রেরণা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। বস্তুতঃ এহেন পরস্পর বিরোধী দুঃইভাবের মাঝে সামঞ্জস্য সৃষ্টির মাঝেই সাম্য নিহিত। অথচ পুঁজিবাদ স্বার্থপরতার নীতিকে এককভাবে গ্রহণ করে থাকে। পরার্থতার কোনই স্বীকৃতি দিতে আদৌ প্রস্তুত থাকে না। আর এই স্বার্থপরতার কারণেই প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ নিজের কোন ভোগ-বিলাস ছাড়া স্বহস্তে ধ্বংস করে দেবে, তবুও যাদের খুবই প্রয়োজন তাদেরকে দিবে না। সত্যি কথা বলতে কি—এ এক চরম পাশবিকতা ছাড়া আর কিছুই না। এটা অযৌক্তিক ব্যবস্থাপনার বহিঃপ্রকাশ। অতিরিক্ত উপার্জনকারীরা কি ঐ অতিরিক্ত সম্পদ নিজের ইচ্ছায় তৈরী করতে পারে ? নিশ্চয় না ? তাহ'লে তার কি অধিকার আছে উহা ধ্বংস করার ? নিম্নে কতিপয় নির্মম উদাহরণ পেশ করা গেল, যাদ্বারা তাদের নির্মম পাষাণ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যাবে।

[এক] ডাম্পিং প্রথা ঃ পুঁজিবাদে ডাম্পিং প্রথা সবচেয়ে অমানবিক। উৎপাদনের পর কোন সম্পদ ধ্বংস করার নামই হল ডাম্পিং।

এই সম্পর্কে গানথার তার Inside Latin America বইতে ব্রাজিলের সে কফির কাহিনী বর্ণনা করেছে তা সত্যিই বেদনাদায়ক। ১৯১৪ সালে ব্রাজিলে প্রচুর কফি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই বছর উহার বাজার দর কম থাকায় মুনাফা হচ্ছিল না। যার ফলে উক্ত কফির বেশ কিছু অংশ ধ্বংস করে উহার বাজার দর ঠিক রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য ১৩২ পাঃ ওজনের মোট চার মিলিয়ন বস্তা বিপুল পরিমান অর্থব্যয়ের পর ধ্বংস করা হয়। অথচ সেই বছর ব্রাজিলে বহু লোককে অর্ধহারে তথা অনাহারে দিন যাপন করতে হয়েছিল।

যার উপর সমাজতন্ত্রের সমগ্র প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। অথচ এই অহংবোধই হলো সাম্যের চরম পরিপন্থী।

সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হল শ্রেণীর সংগ্রাম। এই শ্রেণীর সংখ্যা মাত্র দু'টি। একটি সর্বহারা অপরটি বুর্জোয়া। অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বেষ জনিত সম্পর্কের কারণে সংগ্রাম সংগঠিত হয়ে থাকে। যে সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি সর্বহারা কর্তৃক ক্ষমতা দখল এবং সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা। নীতিগতভাবে সমাজের যাবতীয় উৎপাদন-উপায়, উপকরণ ও বন্টন ব্যবস্থা যতই গোটা সমাজের উপর ন্যস্ত করা হোক না কেন, কার্যতঃ উহা একটি ক্ষুদ্র তথা সংক্ষিপ্ত দলের উপর ন্যস্ত হয়ে পড়ে— প্রথমতঃ উক্ত দলটি সমাজ কর্তৃক নির্বাচিত হলেও হতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু যাবতীয় উপায় উপাদান যখনই তাদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে এবং উহারই মাধ্যমে বন্টন শুরু হয়, তখন অসম্ভাবী রূপে সমগ্র সমাজ উহার অধীন ও দৃষ্টিবদ্ধ হতে বাধ্য হয়, যার ফলে সেই দেশের বা সমাজের ব্যক্তি তথা সমষ্টির যাবতীয় জীবন-যাপন ও উপকরণসমূহ বন্টন উক্ত ক্ষুদ্র দলটির মর্জির উপর নির্ভর করে। পরিশেষে স্বভাবতঃই সমাজের সমগ্র জন সমষ্টি উক্ত দলের কাঁচামালে পরিণত হয়। উক্ত দল বা নিয়ন্ত্রিত পুঁজির মালিকরা সমাজের সমগ্র ব্যক্তিকে নিজের প্রবৃত্তি অনুসৃত প্লান প্রোগ্রাম মোতাবেক ঢেলে সেজে গীন করে—যেমন কর্মকার লোহা গলিয়ে তার ইচ্ছামত দা, কুড়াল প্রভৃতি তৈরী করে।

নিঃসন্দেহে এ ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে খুবই মারাত্মক। এ ব্যবস্থাতে যদিও মনে হতে পারে যে মানুষের প্রয়োজনানুগ উপকরণ ইন-সাফের সাথে সমানভাবে বন্টন করা হবে অথচ বাস্তবে তা আদৌ হয় না। বরং যেখানে চরম অত্যাচার, জুলুম, নিপীড়ন শ্রমিক শ্রেণীর উপর পড়তেই থাকে। একটা প্রাণীর বা জন্তুর মত তাকে সব কিছুই সহ্য করতে হয়। ১৯৬৮ সালের একটি সরকারী ঘোষণা দ্বারা উহার নজীর মিলে। উক্ত ঘোষণাতে বলা হয়, 'হরতাল করলে ১৫ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে।" প্রভদা ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৫৮।

এই প্রসঙ্গে মিলাভন জিলাস কর্তৃক রচিত 'দি নিউ ক্লাস' নামক পুস্তকের

ক'টি লাইন বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। উক্ত পুস্তকে তিনি বলেন সমাজতন্ত্রের নীতি হ'ল কৃষক ও শ্রমিকদেরকে চুষে খাওয়া। এরই প্রেক্ষিতে বাধ্যতা-মূলক শ্রম সমাজতন্ত্রের একটি বাধ্যতামূলক অঙ্গে পরিণত হয়েছে। "তাই আজকের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে শ্রমিকদের চেতনহীন যন্ত্রের মত ব্যবহার করা হচ্ছে। যন্ত্রের যেমন স্বাধীন আশা আকাংখা বলে কিছুই নেই, তেমনি শ্রমিকদের সব কিছুই সমাজতন্ত্রের যূপ কাষ্ঠে বলি হচ্ছে।"

একেই বলে সাম্যের নামে দাস প্রথা প্রবর্তন এবং এটাকেই নাকি প্রতিনিয়ত সাম্যের স্বর্গ বলে প্রোপাগাণ্ডা চালানো হয়।

সমাজতন্ত্রে সাম্যের নামে সর্বহারাদের রাজ্যে এমন অসাম্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যা কিনা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে হার মানিয়ে ছাড়ে। ফরাসী সাম্য-বাদী লেখক ওয়াইভন কর্তৃক প্রকাশিত একটি আয়ের তালিকা দ্বারা তা কিছুটা আঁচ করা যায়। সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রমিকদের বেতনের হার ২৫ রুবল থেকে ৩০০০০ রুবল পর্যন্ত। অর্থাৎ মোটামুটি উহার পরিমান বাংলাদেশী টাকায় ৫ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা দাঁড়ায়। যার অনুপাত ১ঃ১২০০। পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে শ্রমিকদের বেতনের হার ১ঃ৪১ এর মত হবে। তাহ'লে প্রতীয়মান হয় যে, সেখানে কেমন সাম্য প্রতিষ্ঠিত আছে?

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ব্রিজি নারায়ণ তার পাণ্ডিত্য পূর্ণ লেখা 'Maxim is dead' এ কতকগুলো যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন, রাশিয়ার গড়-পরতা শ্রমিকের আয় বোম্বে ও লাহোর থেকে ক

এতো গেল আয়ের আনুপাতিক হারের তুলনামূলক অসাম্যের কথা আলোচনা। এরপর রয়েছে শ্রমিক ও প্রভুদের বা পরিচালকদের পরিবেশ গত পার্থক্যের আলোচনা এবং সে এক আশ্চর্যের বিষয়। এই প্রসঙ্গে Andrew Smith দেয়া একটি বর্ণনা দ্বারা কিছুটা অন্ততঃ আঁচ করা যায়। একজন সাধারণ শ্রমিকের বসবাস স্থল একটা পশুর বাস স্থল থেকেও নিকৃষ্ট মানের। পক্ষান্তরে একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার বসবাস স্থল স্বর্গীয় প্রকৃতির।

সমাজতন্ত্রে এরূপ অবস্থার উন্মেষ ঘটা অতি স্বাভাবিক। কেননা সমাজ-তন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে সমাজের এলিট শ্রেণীকে অবশ্যই হাত করতে

হবে। আর এই এলিটদেরকে হাত করতে হলে তাদেরকে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। তা না হলে এলিটরা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে এবং চেতনাহীন শ্রমিকদেরকে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে, তখন সমাজতন্ত্র আর তার অস্থিত্বে বহাল থাকতে পারবে না।

সুতরাং সমাজতন্ত্রে আজ আর কোন সাম্য নেই, অতীতেও ছিল না। সমাজতন্ত্রের মুরব্বী দেশ রাশিয়া, সেখানে শ্রমিকদেরকে আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। সাম্যের নামে সেখানে চলছে এক অমানবিক নির্যাতন। সুতরাং এহেন অবস্থাতে কি সাম্যের কোন নাম-গন্ধ থাকতে পারে সেখানে? পাঠকবর্গ তা নির্ণয় করবেন।

[তিন] মৌল মানবাধিকার সাম্যের অপরিহার্য উপাদান। সমাজতন্ত্রে এর কোন স্বীকৃতি নেই। কেবলমাত্র উদর পুত্তিতেই মৌল মানবাধিকার শেষ নয়, যা কিনা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ বলে বেড়ায়। আরও অনেক মৌল অধিকার আছে, যার স্বীকৃতি ছাড়া মানব জীবনের কোনই মূল্য থাকে না। যদি উদর পুত্তিতেই সাম্য থাকত তাহলে প্রত্যেকেই জেল-হাজতে যেতে কখনই আপত্তি করত না। কিন্তু তা কি কখনও হয়েছে?

সাম্যের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার ও সহানুভূতি একটি অন্যতম দিক। অথচ সমাজতন্ত্রে এর কোনই স্বীকৃতি নেই। সামান্য সামান্য কারণে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে নির্মম শাস্তি প্রদান করা হয়। ১৯৪১ সালের সোভিয়েট সরকারী নির্দেশনামায় জানা যায় যে, ফৌজী সাপ্লাইয়ে নিয়োজিত কোন কর্মচারী অথবা মুজুর যদি কাজ ছেড়ে দেয় বা কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাকে ৫ থেকে ৮ বছর পর্যন্ত কঠিন শাস্তি দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে চাকরি পরিবর্তন করলে ২ থেকে ৬ মাস জেল জুলুমের নির্মম শিকার হতে হয়।

এই সমস্ত জুলুমের প্রতিকারে তারা আদালত হতেও নিজেদের কোন সমর্থন পায় না। সেখানকার আদালতের অর্থ হ'ল, সমাজতান্ত্রিক কর্মকর্তাদের যাতে সুবিধা হয়—তার নিশ্চয়তা বিধান করা। সর্বহারাদের কাতর আর্তনাদে আদালত ভবনের ভিতর কেঁপে উঠলেও ঐ বিচারকদের ন্যায়-দণ্ডের দিল একটু কেঁপে উঠে না। এই প্রসঙ্গে রুশীয় আইনবিদ মিঃ ভাইসিনকী বলেন, আমাদের আদালত যখন কোন সিদ্ধান্ত নেন, তখন

তার মূল দৃষ্টি-ভংগীর সামনে ন্যায় ও ইনসাফের কোন প্রচ্ছন্ন মাপকাঠি থাকে না ; বরং এর বুনিয়াদী লক্ষ হ'ল সাধারণ্যে সোভিয়েট সরকারী আইন বা কার্যক্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা। (Law of the U.S.S.R).

কোন শ্রমিক যদি ঠিকমত বাড়ী না ফিরে, তবে তার স্ত্রী বুঝতে পারে তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। তখন সে তার খাবার পুলিশ স্টেশনে পৌঁছিয়ে দেয়। খাবার ফেরত এলে সে বুঝতে পারে, তার প্রিয়তম স্বামী লেলিনের নামে বলি হয়ে গেছে। এর বিরুদ্ধে স্ত্রীর মুখ খুলে কথা বলার অর্থাৎ কেন তার স্বামীকে হত্যা করা হ'ল- তা জিজ্ঞাসা করার কোনই অধিকার নেই। এরই নাম হচ্ছে সাম্যের দেশ ও সমাজ কেন্দ্রিক বিধান (!) সাম্যের সার্বিক বিকাশ ক্ষেত্র গোটা মানব জীবন। পেটের জন্য আহার, অনুরূপ মুখের জন্য কথা অপরিহার্য। উভয়ক্ষেত্রেই সাম্য পরিব্যাপ্ত। কথা বলার অধিকার সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য একান্ত প্রয়োজন কিন্তু সমাজতন্ত্রে এর কোন সুযোগ নেই, অথচ সমাজতন্ত্র প্রতিনিয়ত প্রচার করছে—কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রই সাম্যের বিধান।

চেকোস্লোভাকিয়ার জন সাধারণ সমাজতন্ত্রের জুলুম, অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি। তাই সেখানকার জনগণ রাশিয়ার নাগ-পাশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ১৯৫৮ সালের আগষ্ট মাসে স্বাধীনতার দাবীতে সংগ্রাম মুখর হয়ে উঠে। কিন্তু তাদের এই স্বাধীনতা অর্থাৎ কথা বলার, চিন্তা করায় এবং তদানুযায়ী কর্ম করার অধিকার এর জবাব দেয়া হল লাল ফৌজের ট্যাঙ্ক ও কামানের আঘাত দ্বারা। হাজারও মানব সন্তানের তাজা রক্তে পিচ্ছিল হয়ে গেল সেখানকার রাজপথ। স্বাধীনতার মুক্ত প্রতীক ছাত্র জনতা তাদের এহেন বর্বরোচিত নির্যাতনের দুর্বার প্রতিবাদ জানাল নিজেদের পায়ে পেট্রোল ধরিয়ে।

আহার যেমন দেহের শক্তি সমর্থ রক্ষার জন্য অপরিহার্য, অনুরূপ মনের প্রশান্তির জন্য ধর্মও তেমনিই প্রয়োজন। মানুষের চেতনার পরিব্যাপ্তিতে ধর্মীয় অনুভূতি ও তদনুযায়ী ইবাদত অবিচ্ছেদ্য। পৃথিবীর আদি থেকে আজ পর্যন্ত কোন সমাজই পরিদৃষ্ট হয় না যেখানে ধর্মীয় চেতনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। কেননা এটা একটা স্বাভাবিক মানবীয় প্রেরণা। অথচ সমাজতন্ত্র এটাকে বেমালুম অস্বীকার করে মানুষের অন্তর চেতনাকে ভোঁতা

করে দিয়েছে। সমাজতন্ত্র ধর্মকে আফিমের সাথে তুলনা করে তাকে উচ্ছেদ করতে ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছিল। কিন্তু বেশী দিন স্বাভাবিকতাকে চাপিয়ে রাখা যায় না। চীন আজ ধর্মকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এরই প্রমাণ স্বরূপ গত বছর চীনা মুসলমানদের কয়েক জনকে হজ্জব্রত পালনের অনুমতি দেয়া হয়। রাশিয়ার মুসলমানগণ আজ কিনা দৃঢ়তার সাথে তাদের তাহজীবকে অনুসরণে তৎপরতা প্রদর্শনে এগিয়ে আসছে। এদিক দিয়ে পোলাণ্ডের মুসলমানগণ অনেক এগিয়ে এসেছেন। এ সব কিসের আলামত? নিশ্চয় স্বাভাবিকতার প্রকাশ ছাড়া আর কি?

[চার] মানুষের বৈচিত্রময় প্রকৃতিগত গুণ-ক্ষমতার মাঝে সাম্য নির্ভর সমাজ গঠনে প্রধানতঃ দুটো মানবীয় গুণাবলী সেই সমাজের লোকদের মাঝে থাকা অপরিহার্য। একটি হ'ল পরস্পরের কল্যাণ কামনা। শেষটি হ'ল একে অপরের জন্য আত্মত্যাগ। সমাজতন্ত্র এই দুটো গুণকে একেবারেই অস্বীকার করতে চেয়েছে। পরস্পরের কল্যাণ কামনা ও আত্মত্যাগের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সম্পত্তির মালিকানা। কিন্তু সমাজতন্ত্রে এ দুটোই অনুপস্থিত।

সমাজতন্ত্রে কল্যাণ ও আত্মত্যাগ জনগণের পরস্পরের জন্য নয়, বরং সমাজতন্ত্র বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের জন্য। যাবতীয় কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য। এখানে রাষ্ট্রের কর্মধররাই হন উহার একচ্ছত্র অধিকারী। অনুরূপ আত্মত্যাগ সমাজতন্ত্রের জন্য অর্থাৎ নেতাদের জন্যেই সংরক্ষিত। কেননা জনগণ তাদেরই, তারা জনগণের জন্য নহে।

বলা বাহুল্য, সমাজতন্ত্রে এরূপ মনোভাব পোষণ করার পিছনে সেই সমাজের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসই দায়ী। সমাজতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা তথা বিশ্বাসের মূলে রয়েছে এক চরম ভ্রান্ত দর্শন। যে দর্শন মানুষকে মানুষ রূপে স্বীকৃতি দেয় না, চরম পশু বা যন্ত্র ছাড়া। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে নেতারাই হলেন মানুষ আর অন্যান্যরাই হল তাদের সেবক বা দাসানুদাস। সেবকরা চেতনাহীন, আর নেতারা চেতনা সম্পন্ন এবং এটা নাকি প্রকৃতিগত।

পরিশেষে বলতে কি, সমাজতন্ত্রে মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের ধারণা মানবিক না হওয়ার কারণেই এরূপ অমানবিক অবস্থা। বস্তুতঃ সমাজতন্ত্রে সাম্যের মৌলিক উপাদানসমূহ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাই সমাজতন্ত্র

সাম্যহীন এক চরম অসাম্যমূলক ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহণ করেছে। এবং এটা হওয়া অতি স্বাভাবিক।

উপসংহার

মানুষ পৃথিবীতে বসবাস ক্ষণ থেকে আজ পর্যন্ত অ-নে-ক কাল অতি-ক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কালের এত ব্যবধানমূলক দূরত্ব এবং আবর্তন বিবর্তন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা স্বত্ত্বেও অসাম্য প্রতিষ্ঠার কার্যকরণ প্রক্রিয়া অভিন্ন রয়েছে। যে সমস্ত কারণে অতীতে অসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আজও ঠিক সেই একই কারণ উহার পিছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। খোদাদ্রোহীতা, দাম্ভিকতা, স্বার্থপরতা, ক্ষমতার মোহ অহংবোধ, প্রতিহিংসা, উপভোগ বাসনা, সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদী অভিলাশ প্রতি যে কারণ।

গ্রীক. রোমান, মধ্যযুগ ও আধুনিক কালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, উপরোক্ত কারণসমূহের দরূণে অসাম্য বিরাজমান ছিল এবং আছে। আদিযুগ থেকে বর্তমান যুগের মানুষ বৈষয়িক দিক থেকে প্রভূত পরিমান অগ্রগতি সাধন করছে ঠিকই, কিন্তু তাদ্বারা লাভের থেকে ক্ষতির বলয়টাই সর্বাধিক। প্রত্যেক যুগের অসা-ম্যের পিছনে একই মানসিকতা ও স্বভাব বিদ্যমান, তবে প্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্নতর। বিজ্ঞানের আবিষ্কার অসাম্য প্রতিষ্ঠার পথকে অধিক গতিশীল করেছে।

গ্রীক সভ্যতায় মানুষের মাঝে চরম অসাম্য বিরাজমান ছিল। একটি শ্রেণী তাদের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা তথা ক্ষমতার বলে অর্জিত কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে অপর শ্রেণীকে, যাদের সংখ্যাই সর্বাধিক, দাসানুদাসে পরিণত করে রেখেছিল। দাস শ্রেণী গৃহ-পালিত পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হত। এমন কি তাদের হাটে বাজারে প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রির সুবন্দোবস্ত ছিল। প্রভুরা তাদের দাসদের হত্যা বা জবাই করতে পারত, তাতে কারোর কিছু বলার ছিল না বা বলতও না।

অনুরূপ রোমান সভ্যতার অবস্থাও ছিল তাই। বরং গ্রীক সভ্যতা

থেকে আরও মারাত্মক। রোমান সরকার দাস-ব্যবহার সম্পর্কিত Dom-irica Potestas আইন জারী করে দাসদের হত্যা করার অনুমতি প্রদান করেন। দাসদেরকে অর্থ-উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ধরা হতো।

উপরোক্ত যুগ দু'টির ধারা পরম্পরার কালোশ্রুতি স্বরূপ বিশ্বমানবতার জন্য উপহার মধ্যযুগ। মধ্যযুগে মানুষ মানুষের সম্পর্ক গ্রীক ও রোমান যুগের ন্যায় দাস প্রভুই ছিল। কিন্তু নামকরণ ছিল অন্য রকম। মধ্যযুগে ভূ-স্বামী অর্থাৎ জমিদার ছিল সমস্ত ভূ সম্পত্তির মালিক আর প্রজা বা ভেমেল বা সার্ভরা ছিল তাদের প্রজা। এই জমিদার এবং প্রজার সম্পর্ক ছিল দাস প্রভূতুল্য। প্রভূ ইচ্ছে করলে যে কোন সময় তার নিকট থেকে ভূ সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে অন্য কাউকে দিতে পারত এবং করতও তাই। অর্থাৎ জমি-দারগণই ছিল প্রজাদের রুটি রুজির মালিক-প্রভূ।

মধ্যযুগের পরেই বর্তমান সভ্যতার পালা। যাকে বলা হয় আধুনিক যুগ। আধুনিক যুগকে যদি আমরা পরাধীনতা তথা অসাম্যের যুগ বলি তাহলে তেমন অত্যুক্তি হবে বলে আমার মনে হয় না। আধুনিক, সবদিক দিয়েই আধুনিক। কিন্তু দাস-প্রভূ সুলভ মানসিকতার ক্ষেত্রে এর কার্যকরণ ধারা পূর্ববৎ।

বর্তমান বিশ্বে এমন একটি দেশ নেই, যেখানে অসাম্যের নাম নমুনা নেই। প্রতিটি দেশেই চলছে অসাম্য আর অসাম্য। তবে কোথাও কোথাও উহার মাত্রা কম বেশী—এই যা।

বর্তমান বিশ্বে সব থেকে সভ্যতার তথা মানবতার দাবীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এ কথা কে না জানে। সেখানে আজ কি চলছে? কালা আদমি আর ধলা আদমিদের ভিতর পার্থক্য। আর এই পার্থক্যই অসাম্যের অনুশীলন প্রক্রিয়াকে জটিলতর করে তুলেছে। এ ছাড়া রয়েছে ধনী-দারি-দ্রের গগনচুম্বী পার্থক্য। শুধু তা-ই-না, তারা ধর্মকেও অসাম্যের মানদণ্ড হিসেবে ধরে নিয়ে উহার সুদূর প্রসারী প্রক্রিয়া সারা বিশ্বব্যাপী চালিয়ে আসছে।

এর পরেই আমরা ব্রিটেন, কানাডাকে ধরতে পারি। যেখানে ঐ একই শ্রেণীর বৈষম্য বিদ্যমান। বর্তমান ব্রিটেন সরকার ইংরেজ, অ-ইংরেজ পার্থক্যজনিত মানদণ্ডে তাঁরা দেশের জনগণকে বিবেচনা করছেন। এর ফলে সেখানে এক চরম অসাম্যমূলক অবস্থা বিরাজমান।

আফ্রিকার অবস্থারও ঠিক তাই। তবে সেখানে ধলা আদমিরা কালা আদমিদের উপর প্রভুত্ব করছে। সেখানে ধলা আদমিরা মানুষ আর কালা আদমিরা মানুষ নয়, অন্য কিছু; যার শিকার স্বরূপ প্রতিদিন আফ্রিকান কোন কোন দেশে প্রচুর রক্ত ঝরছে।

বিশ্ব দরবারে রাশিয়া আর এক নবতর সাম্যের ফরমুলা আবিষ্কার করে গোটা দেশকেই দাস-প্রভু সম্পর্ক স্থাপন করেছে। চীনও অনুরূপ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তারই অনুসারী।

রাশিয়ার পাশেই ভারত। ভারতে বংশ বা শ্রেণীজনিত কারণে কেউ মানুষ, যাদের জন্য শত সুযোগের দুয়ার খোলা আর কোন কোন শ্রেণী বা বংশ তারা মানুষ নয়, তাই তাদের জন্য সুযোগ সুবিধার সব দুয়ারই বন্ধ।

এই রকম প্রত্যেকটা দেশের অবস্থা প্রায় একই। সারা বিশ্বে অসাম্য আর অসাম্য। চারদিকে যেন অসাম্যের জয় জয় শব্দ শ্রুত হচ্ছে। তাই বলে বাংলাদেশ এর থেকে মুক্ত নয়, এখানেও চরম অসাম্য বিরাজ করছে। একদিকে গরীব দুঃখীর মিছিল—ভাত চাই, কাপড় চাই, নাহলে বাঁচার কোন সুযোগ নেই। এই রকম অনেক শ্লোগান অসাম্যের নজীর বহন করছে।

এখন প্রশ্ন ঃ এই রকম চরম অসাম্য থেকে ত্রান পেয়ে সাম্যের মুখ চোখে দেখা কি সম্ভব না? জবাব অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু প্রয়োজন তা অবলম্বনের। আগেই বলেছি সাম্য বিধানে, স্বভাবে নয়। আর সে বিধান হল ইসলাম—আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (সঃ) প্রদর্শিত সর্বকাল, সর্ব মানুষের, সর্বক্ষেত্রের জন্য একমাত্র উপযোগী।

বিশ্বের মানুষ ইসলামকে সঠিক ভাবে মানছে না বলে আজ সারা বিশ্বে অসাম্য বিরাজ করছে। যদি মানত তাহলে আর এরূপ হত না। সুতরাং বর্তমান বিশ্বে সাম্য আনতে হলে বা প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রত্যেকেই ইসলামের বিধানকে আঁকড়ে ধরে একমাত্র আল্লাহকেই নিঃশর্ত আনুগত্য করতে হবে—এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় নেই, থাকতে পারে না। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর বিধান বুঝার ও অনুশীলনের তৌফিক দিন, যার মাধ্যমে আমরা সাম্যানুভব করে এই কাল ও পরকালে শান্তি ও কল্যাণ পেতে পারি।

—আমিন।

গ্রন্থ পঞ্জি

১। ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা—শামসুল আলম
২। তাফহিমুল কোরআন—সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী
৩। ইসলামে শ্রমিকের অধিকার—ফরিদ উদ্দিন মাসউদ
৪। পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি—মুহাঃ আবদুর রহিম
৫। ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম—মুহাম্মদ কুতব
৬। ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী
৭। ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা — ঐ
৮। পারস্পারিক সম্পর্ক—খুররম জাহ মুরাদ
৯। ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি—মুহাঃ আসাদ
১০। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা—মোহাঃ সামসুল হক
১১। মাসিক পৃথিবীর বিভিন্ন সংখ্যা—বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
১২। জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম—দেওয়ান মোহাঃ আজরফ
১৩। জীবন দর্শনের পুনর্গঠন— ঐ
১৪। রাহে আমল—আল্লামা জলীল আহসান নাদভী
১৫। দৈনিক সংগ্রাম—বিভিন্ন সংখ্যা
১৬। কমুনিষ্ট মেনিফেষ্টো—মার্কস এঙ্গেলস্
১৭। ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা—মুহাঃ আবদুর রহিম
১৮। অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান—আবুল আলা মওদুদী

ঃ সমাপ্ত ঃ

লেখকের যে সমস্ত বই প্রকাশের পথে ঃ

- স্বাধীনতা ও ইসলাম
- ইসলামের রাজনৈতিক কৃষ্টি
- রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ইসলাম
- সত্যবাদী কে ?
- মানুষ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল ইমরান লাইব্রেরী

৫০৫, এলিফ্যান্ট রোড,

মগবাজার—ঢাকা